বাঙ্গালীর প্রতিভা

ও

সুভাষচন্দ্র

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুহ সঙ্কলিত

লণ্ডন মিশনারি ইন্‌ষ্টিটিউসন ও সাউথ সুবার্ব্বন ব্রাঞ্চ স্কুলের

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

প্রকাশক—
শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুহ
১৯ সি, প্রিয় নাথ মল্লিক রোড
কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। বাণী-বীথি—২ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা……সোল এজেণ্ট।

২। শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। রায় চৌধুরী এণ্ড কোং—১১৯নং আশুতোষ মুখার্জি রোড,
ভবানীপুর দক্ষিণ কলিকাতা।

৪। গ্রন্থকার—১৯,সি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কালিঘাট, কলিকাতা

১৯৪৬ সাল

প্রিণ্টার—বলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২ কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ভূমিকা

"বাঙ্গালীর প্রতিভা" বাঙ্গলার মনীষীগণের কীর্ত্তিকথা লইয়াই বিরচিত। যে সকল বাঙ্গালী নিজ নিজ প্রতিভাবলে জগতীতলে মহীয়সী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ সাহিত্যে, কেহ বিজ্ঞানে, কেহ ধর্ম্ম প্রচারে কেহবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আবার কোন কোন বীর সামরিক বিভাগে আপনাপন প্রতিভা প্রকাশ করিয়া বঙ্গভূমির গৌরব শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। যাঁহাদের যশোভাতি ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূর পাশ্চাত্য গগন উদ্ভাসিত করিয়াছে এবং যাঁহারা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বহু মনীষী কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির আসন উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদেরই প্রতিভার কথঞ্চিৎ পরিচয় এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র এই মহামানবগণের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা তাঁহাকে যে জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে এই মহাপুরুষের কীর্ত্তিকথাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সামরিক বিচারালয়ে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রতিনিধি মেজর জেনারল শাহ-নওয়াজ প্রভৃতির বিচার কালে সুভাষবাবুর অনেক কীর্ত্তিকথা জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। "আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট" সম্বন্ধেও অবশ্যজ্ঞাতব্য বহুতথ্য "অমৃতবাজার পত্রিকা" "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্রে এবং "আনন্দ বাজার পত্রিকা" "নবযুগ" প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজি সংবাদপত্রগুলি হইতে সেই সকল তথ্যের সরল অনুবাদ এবং

আনন্দ বাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত "নেতাজীর অন্তর্ধান" কাহিনী প্রভৃতি কয়েকটি সংবাদ একত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া বাঙ্গলার কৌতূহলী পাঠক পাঠিকাগণের সমক্ষে স্থাপন করিবার জন্যই এই গ্রন্থের অবতারণা। সুভাষচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে লিখিত "Rebel President" নামক বিখ্যাত ইংরাজি গ্রন্থ হইতেও কোন কোন অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। মাসিক বসুমতী হইতে 'ত্রিপুরী অভিভাষণ' এবং নবযুগ হইতে 'সিঙ্গাপুর অভিভাষণ' নামক প্রবন্ধদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এজন্য আমি এই সকল সংবাদপত্র সম্পাদক ও গ্রন্থকারের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। মৎপ্রণীত কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থ-খানির দ্বারা পাঠক পাঠিকাগণের এবং সুকুমার-মতি বালক বালিকাগণের কৌতূহল কিয়ৎ পরিমাণে চরিতার্থ হইলে লেখকের শ্রম সফল হইবে।

উপসংহারে নিবেদন এই যে সুভাষচন্দ্রের জীবনের কিয়দংশ এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী যদি কোনও দিন লোকলোচনের গোচরীভূত হয়, তাহা হইলে :অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারে। সুতরাং এই গ্রন্থে আমি তাঁহার অলৌকিক জীবনের কতকগুলি উপাদান মাত্র দিতে সক্ষম হইয়াছি। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তা যখন এই মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এই উপাদানগুলি তাঁহার আবশ্যক হইতে পারে। আর এক কথা,—সাহিত্যক্ষেত্রে এই আমার প্রথম লেখনী ধারণ-পদে পদে উপাহাসাস্পদ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তথাপি দুঃখিত হইবার কারণ নাই। যেহেতু কালিদাসের ন্যায় মহাকবিও বলিয়াছেন—

মন্দঃ কবি-যশঃ প্রার্থী গামিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ॥

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রতিভা	...	...	১
সুভাষচন্দ্র	...	...	৫
স্বাধীনতার মূল্য	...	...	৭
ভারতের বাহিরে বাঙ্গালীর স্থান	...	...	১১
সুভাষচন্দ্রের জন্ম—শিক্ষা—ধর্ম্মালোচনা কলেজ জীবন—সন্ন্যাস গ্রহণের চেষ্টা-সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা	...	...	২৩—৩২
সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মজীবন ..বেঙ্গল নেশনাল কলেজ-হরতাল-উত্তর বঙ্গে বন্যা—স্বরাজ্যপার্টি—ফরওয়ার্ড পত্রিকা-কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা—G. O. C.—মহাত্মার বিরুদ্ধাচরণ—রাজনীতিক লাঞ্ছিত দিবস—সহীদ যতীন দাসের মৃত্যু-ছাত্রসম্মেলন—স্বদেশী লিগ—অলডারম্যান ও মেয়র—গোলটেবিল বৈঠক-উত্তর বঙ্গে পরিভ্রমণ—ভিয়েনায় অবস্থিতি জানকীবাবুর মৃত্যু—ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন—ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন-কারামুক্তি	...	...	৩৩—৫৪
হরিপুরা ও ত্রিপুরী অধিবেশন ও ফরওয়ার্ড ব্লক		...	৫৪—৬২
অন্ধকূপ হত্যা স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ	...	...	৬২
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও অলডার ম্যান		...	৬৪
রাজনৈতিক ইচ্ছাপত্র	...	...	৬৫
সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান	...	...	৭২—৭৬
যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্ব......সামরিক শিক্ষা—হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ, ভারতীয় স্বাধীন প্রতিষ্ঠান—আজাদ হিন্দ ফৌজ...			৭৭—৮২

বিষয়			পৃষ্ঠা
সিঙ্গাপুরের অভিভাষণ	...	...	৮৩
আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট	...	...	৯০
ঝাঁসীর রাণী সেনা বাহিনী	...	...	৯২
বালক সেনা	...	..	৯৮
মালয়ে বক্তৃতা	...	...	১০০
ইটালিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ	...	...	১০৫
মাসিক বুলেটিন	...	...	১০৬
রেডিও ষ্টেশন	...	...	১০৭
দুর্ভিক্ষে সাহায্য	...	...	১০৭
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ	...	...	১০৮
আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক	...	...	১০৯
স্বর্ণদ্বারা নেতাজীর ওজন	...	...	১১৩
জিয়াওদি এস্টেট	...	...	১১৩
আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান		...	১১৪
নেতাজীর স্বদেশ প্রেম	...	...	১১৫
প্রস্তুত হও—সময় নাই	...	...	১১৫
ইনফল আক্রমণ	...	...	১১৬
ইনফল হইতে পশ্চাদপসরণ	...	...	১১৮
রেঙ্গুন পরিত্যাগ	...	...	১২১
নেতাজীর আদেশ	...	...	১২২
আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ	...	...	১২৫
সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ	...	...	১২৬
আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণ	...	...	১২৭
আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর সঙ্গীত	...	...	১২৮
নেতাজীর বাণী	...	...	১২৯
নেতাজীর বৈশিষ্ট্য	...	...	১২৯
আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ডাক টিকিটের নমুনা		...	১৩২
সুভাষচন্দ্রের মনীষা ও চরিত্র বিশ্লেষণ	...	...	১৩৩

প্রতিভা

মানব যেদিন প্রতিভার পূজা করিতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতেই জগতে প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হইয়াছে। মহাপুরুষগণ নিজ নিজ জ্ঞান-গরিমা অথবা মহান্ কার্য্যকলাপের দ্বারা এই মরজগতে যে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যান, ইতিহাস যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহারই স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া মহিমান্বিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনী কিংবদন্তীতে পর্য্যবসিত হয়। বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও দুইশতবৎসর পূর্ব্বে প্রকৃত ইতিহাসের সৃষ্টি হয় নাই। প্রাচীন সভ্যতার অরুণ আলোক যে গ্রীস ও রোমে প্রথম প্রকটিত হয়, সেখানেও প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের কাহিনী বিস্মৃতির অতলজলে নিমজ্জিত ছিল। কিংবদন্তীর সাহায্যে অনুসন্ধিৎসু মানব কিয়ৎ-পরিমাণে তাহার উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রীসের আদি কবি হোমার ভার্জ্জিল প্রভৃতির সম্বন্ধে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তথাপি বহু তথ্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে। হোমার অন্ধ অবস্থায় ট্রয়যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি' নামক যে দুই মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইঁহাকে কাব্য-জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তাঁহার দেশবাসিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার জন্মস্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে সমগ্র-দেশ যখন তাঁহার কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হইল, তখন একে একে সাতটী দেশ তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া দাবি করিতে লাগিল।* ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্‌সপিয়ারও জীবদ্দশায় তাঁহার স্বদেশবাসিগণের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর অনেক পরেই তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিল।

এদেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা যাইতে পারে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, উপপুরাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির সহিত এদেশের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু তাহা জানিবার উপায় নাই। কোন কোন মনীষী এই গভীর জ্ঞানসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া দুই চারিটী রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু একটা জাতির জ্ঞানভাণ্ডারে সে যে কত সামান্য তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল, কুমার-সম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য জগতের যে কোনও সভ্যজাতির শ্রেষ্ঠ কাব্যের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার জীবিতকালের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন।

* Seven countries claimed for Homer being born through which the living Homer had passed without a bread.

সকলেই অবগত আছেন, এই মহাকবি কোন্ সময়ে এবং কোন্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভারতভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন, বহু গবেষণার ফলেও তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। অথচ তাঁহার মহাকাব্যনিচয় শুধু ভারতে নহে, পাশ্চাত্য দেশের সুধীগণ কর্ত্তৃকও উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছে।*

ভারতবাসী ইতিহাস রচনায় উদাসীন হইলেও কখনও প্রতিভার পূজা করিতে শিক্ষা করে নাই, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। উজ্জয়িনীরাজ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা কালিদাস প্রমুখ নবরত্নের দ্বারা সুশোভিত ছিল একথা একরূপ ঐতিহাসিক সত্য। মোগল-সম্রাট আকবর আবুলফজল, বীরবল, ফৈজি প্রভৃতি অশেষ প্রতিভাশালী

* বিখ্যাত জার্ম্মান কবি গেটে এই মহাকবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'শকুন্তলা' পাঠ করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যে প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণ তাঁহার কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছেন। ইংরাজি অনুবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'Wouldst thou the young year's blossom
And the fruits of its decline
And all by which the soul is charmed
Enraptured, feasted, fed ?
Wouldst thou the earth and heaven itself
In one sole name combine ?
I name thee, O Sakuntala !
And all at once is said."

ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন একথাও সর্ব্বজনবিদিত। কোনও জাতির আত্মচৈতন্যের উদয় হইলে, সে জাতি আপন সমাজের মহৎ ব্যক্তিগণের প্রতিভার সমাদর করিয়া পরোক্ষভাবে আপনাদিগকেই সম্মানিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজে গুণবান সেই কেবল গুণের আদর করিতে জানে। যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত সম্মান না দিলে নিজেরই যোগ্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কবি বলিয়াছেন—

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্বলঃ॥
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ।
করি চ সিংহস্য বলং ন মুষিকঃ॥

বঙ্গানুবাদ

গুণীগণ গুণবানে সমাদর করে,
নির্গুণ গুণীর গুণ কি বুঝিতে পারে?
বলীই বলীর বল বুঝে ভালমতে,
দুর্ব্বলের সাধ্য কিবা আছে এ জগতে?
ঋতুরাজ বসন্তের মাধুরী অপার,
পিকবর জানে শুধু, বায়স কি ছার।
কেশরীর পরাক্রম করি ভাল জানে,
নগণ্য মুষিক বল জানিবে কেমনে?

সুভাষচন্দ্র

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্র উপকূলে যে মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, কে জানিত অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার কার্য্যকলাপের দ্বারা এই অধীন পর-পদ-দলিত জাতির মসী-লাঞ্ছিত ইতিহাস সুবর্ণাক্ষরে মণ্ডিত হইবে? আজ যাঁহার অনন্যসাধারণ চরিত্র শুধু ভারতের নহে, পরন্তু সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছে, যিনি এই সহস্রবর্ষব্যাপী পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অসামান্য প্রতিভাবলে সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, রাজা সীতারাম রায় ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উপযুক্ত বংশধর বলিয়া আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যাঁহার মস্তকে জয়মাল্য দিয়া বাঙ্গালাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহার অলোকসাধারণ চরিত্র ও অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী লোক-লোচনের সমক্ষে উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লেখক আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন।

এই পরাধীন ভারতের শত শত যোদ্ধা স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করিয়া আত্মপ্রাণ বলি দিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার যে অপার্থিব সুখ তাহা একমাত্র নেতাজী উপলব্ধি করিয়াছেন। আসামের কিয়দংশ বৃটীশের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া এবং তাহাকে স্বাধীন ভারত আখ্যা দিয়া অল্পদিনের

জন্য হইলেও সুভাষ চন্দ্র এই ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

দেশে একজন মহাপুরুষের জন্ম হইলে সে দেশ গৌরবান্বিত হয়। মহামতি শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বড়লাটকে বলিয়াছিলেন—"আজ বাঙ্গালাদেশ যে বিষয় চিন্তা করে, কাল সমগ্র ভারতবর্ষ সে বিষয় চিন্তা করিবে।"* সুভাষচন্দ্রের জীবন-চরিত আলোচনা করিলে, এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভিন্ন আর কেহই এ প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। কিছুদিন পরে মহাসমিতি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সুভাষচন্দ্রের মতই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আবার ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে 'চরমপত্র' দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে "Quit India" বা "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাবের জনক বলা যাইতে পারে।

প্রত্যেক যুগ-সন্ধিকালে নূতনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচলিত ও পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার প্রয়োজন হয়। এই সময়ে মহাপুরুষগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সংগ্রাম পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা পুরাতনের অপূর্ণতাকে

* What Bengal thinks today, the whole of India will think tomorrow

নূতনত্বে পর্য্যবসিত করিয়া নবযুগের সূচনা করিয়া দেন। সুভাষচন্দ্রকে এই যুগপ্রবর্ত্তক ঋষি আখ্যা না দিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বস্তুতঃ সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনের কার্য্যাবলি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি যেন আলোকবর্ত্তিকা হস্তে ধারণ করিয়া ভারতের নেতৃবৃন্দের পুরোভাগে গমন করিয়াছেন এবং **দেশ-মাতৃকাকে** দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার প্রকৃষ্টতম উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

স্বাধীনতার মূল্য

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র এবং ধর্ম্মনীতি প্রচারে কেশবচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীগণ বাঙ্গালাদেশের অলঙ্কার, একথা শুধু আমাদের দেশে নয়, সুদূর পাশ্চাত্যদেশের বিদ্বন্মণ্ডলীও স্বীকার করিয়া থাকেন। সুভাষবাবুর বক্তৃতায় আমরা সুরেন্দ্রনাথ বা বিপিনচন্দ্রের eloquence বা বাক্‌পটুতা দেখিতে পাই না একথা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার বর্ক্তৃতায় যে মাদকতার সঞ্চার হয়, তাহা অন্য কোথাও দেখিতে পাই না। শব্দসম্পদে নেতাজী সুরেন্দ্রনাথ বা বিপিন চন্দ্রের তুল্য না হইলেও তাঁহার সরল বাক্যবিন্যাসে এমন মোহিনী

শক্তি আছে, যাহা শ্রোতৃগণকে আত্মহারা করিয়া ফেলে। তাঁহারা যেন কোন্ এক অজানা রাজ্যে গিয়া পড়েন। যিনি মানব মনের উপরে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। শাস্ত্র বলেন 'শব্দ ব্রহ্ম'। এক একটি শব্দে এক একটি অক্ষরের মধ্যে সাধারণ মানবের জ্ঞান-রাজ্যের অতীত যে কত শক্তি নিহিত আছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নহে।

সুরেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ বা সুভাষচন্দ্র ক্ষণজন্মা পুরুষ। বাঙ্গালী জাতির পুণ্যফলে এরূপ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্র-নাথের বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্য হইতে অল্পদিনের মধ্যেই 'ফেডারেশন হল' এর জন্য লক্ষ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে এই বিশ্ব-বিশ্রুত বক্তাই বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের 'বঙ্গবিভাগ' (Partition of Bengal) রূপ নির্দ্ধারিত বিষয়কে (Settled fact) রহিত (Unsettled) করিয়া দিয়াছিলেন। আবার দেখিতে পাই, স্বামী বিবেকানন্দের এক একটি বক্তৃতা শুনিয়া আমেরিকার কোটিপতিগণ তাঁহাদের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অর্থ-রাশি তাঁহার পদতলে অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতায় এই মাদকতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। বক্তৃতামঞ্চে উঠিলে তাঁহার বীরত্ব ব্যঞ্জক অথচ

সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া শ্রোতৃগণ মনে মনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিতে পারেন, স্বাধীনতাই মানবের সনাতন ধর্ম্ম—শুধু মানবের কেন সমগ্র জীবজগতে আমরা কি দেখিতে পাই ? বনের পশু হইতে আকাশ-চারি বিহঙ্গমগণও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক।

এই অপার্থিব সুখের নিকট কুবেরের ধনভাণ্ডার অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাই স্বাধীনতা-যজ্ঞের এই ঋষি যখন উদাত্তস্বরে এই মহান্ সত্য প্রচার করিতে আরম্ভ করেন লোকে তখন তাঁহার পদতলে যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এক একটি সভার সভাপতিরূপে সুভাষবাবু যে পুষ্পমাল্য পাইয়াছেন, লক্ষ লক্ষ টাকায় সেই সকল মাল্য বিক্রীত হইয়াছে। 'আজাদ হিন্দ' ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত দীননাথের বর্ণিত বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে যে পূর্ব্ব এশিয়ায় কয়েকটি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়া তিনি যে পুষ্পমাল্য পাইয়াছিলেন, বার লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহার ভক্তগণ সেইগুলি ক্রয় করিয়াছে।

সুভাষবাবুর এই বক্তৃতা সুদূর ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশে কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহা তাঁহার জাতীয় বাহিনী গঠনের ইতিহাস পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। নেতাজীর উদ্দীপনাময়ী কয়েকটী বক্তৃতা শুনিয়াই প্রবাসী ভারতীয়গণ তাঁহাদের ধনভাণ্ডার এই আজন্ম ঋষির পদতলে উপহার

দিয়াছিলেন। ইহার ফলে অনতিকালমধ্যে ২০ কোটী টাকা সংগৃহীত হইয়া আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

চারণ কবি রঙ্গলাল গাহিয়াছিলেন –

কোটী কল্পদাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায়॥

রঙ্গলালের এই সমর-সঙ্গীত সুভাষচন্দ্রই শুনিয়াছিলেন। এই নিনাদ "কানের ভিতর দিয়া তাঁহার মরমে পশিয়াছিল।" তাই স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়—উন্মাদের ন্যায় তিনি একদিন তাঁহার সাধের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন—যদি দেশ-মাতৃকাকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারেন। স্বাধীনতা মন্ত্রের উপাসক ইটালির উদ্ধারকর্ত্তা ম্যাট্‌সিনি বলিয়াছিলেন, "আত্ম-নির্ভরশীল না হইলে কোনও জাতিই স্বাধীন হইতে পারে না।" সুভাষচন্দ্র দেখাইয়াছেন, আত্মনির্ভরশীল হইয়া একজন মানুষ কিরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। জন্মভূমি ত্যাগ করিবার সময়ে তিনি লোকবল বা অর্থবলের প্রত্যাশা করেন নাই. অথচ বিদেশে গিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে সৈন্যবল ও অর্থবল উভয়ই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কবি রঙ্গলালের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্ঘগঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সাহায্যে

আসামের একটি অংশ জয় করিয়া সত্য সত্যই "দিনেকের স্বাধীনতা" অর্জ্জন করিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন।

ভারতের বাহিরে বাঙ্গালীর স্থান

বাঙ্গলা দেশ রত্ন-প্রসবিনী। রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণ বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-সম্রাট এবং দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রকে উপন্যাস জগতে স্যার ওয়াল্টার স্কট এবং দার্শনিকগণের মধ্যে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিতই তুলনা করা করা চলে। মহামতি গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে আইন-সচিব ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে বাঙ্গলাদেশের অলঙ্কার বলিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মস্তকে জয়মাল্য দিয়াছেন।* সুদূর সাগরপারেও তাঁহাদের প্রতিভা অসামান্য খ্যাতির কারণ হইয়াছে। স্বনামধন্য বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে গিয়া ওজস্বিনী

* The race that has produced a jurist like Dr. Rash Behari Ghose, a poet like Rabindranath Tagore and a scientist like Jagadis Chandra Bose, is a race not to be belittled with.

ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া বিলাতের পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাকে প্রাচীন রোমের বিখ্যাত বক্তা Cicero এবং প্রাচীন গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী Demosthenesএর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

তারপর যখন আমরা দেখি স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম্মসভায় গিয়া সভ্যজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনস্বীগণকে উপনিষদ্ ও গীতার বাণী শুনাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন এবং যখন দেখি তাঁহার প্রশংসাগানে আমেরিকার আকাশ বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল, তখনই মনে করিলাম বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।*

বিজ্ঞান জগতে স্যার জগদীশচন্দ্র যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা শুধু বাঙ্গলার নয়—সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরবস্থল হইয়াছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সমক্ষে বেদীগ্রহণ করিয়া নানা প্রচলিত মতবাদের ভ্রমপ্রদর্শন, এবং তাঁহাদের উত্থাপিত যুক্তি সকলের অসারতা প্রতিপাদন কেবল জগদীশচন্দ্রের গৌরবের কথা নহে, এই ব্যাপারে সমগ্র ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছে। লিভারপুলে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের

---

* শিকাগো ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা দিবার পরদিন তত্রত্য দৈনিক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছিল—Our President was wise enough to keep the best man for the last. After hearing him, we think, how foolish it is to send missionaries in those parts of India where a man like Vivekananda is born.

সভায় অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহা শুনিয়া তত্রত্য প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ শতমুখে এই বাঙ্গালী যুবকের যশোগান করিয়াছিলেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন এবং অলিভার লজ জগদীশচন্দ্রকে বিলাতেই অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

প্যারিসে আন্তর্জ্জাতিক (international) কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে তিনি একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "জীব ও জড় পদার্থের উপর বৈদ্যুতিক সাড়ার সমত্ব।" জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর সভায় বক্তৃতা দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বোস। সেদিন বাঙ্গলার গৌরব জগদীশচন্দ্র জন্মভূমির মৃতপ্রায় শরীরে সঞ্জীবনী-সুধা বর্ষণ করিয়া নব জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন।

ভারতের পূর্ব্বতন গভর্ণর জেনারল লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১৩ সালে বিলাত হইতে জগদীশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "আমার অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে সমগ্র ইউরোপের গবেষণা কার্য্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। ইহাতে ভারতের গৌরব বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে!"

ঋষিকল্প মহাপুরুষ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞানের গবেষণায় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। রসায়ন জগতে তাঁহার দান অমূল্য একথা সুধীগণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রণীত "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" রসায়ন শাস্ত্র

সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ, চরক, সুশ্রুত, বাগভট, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি মন্থন করিয়া তিনি এই অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যশঃ দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বিশ্ব-বিমোহিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একসময়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিল। তত্রত্য বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি সেণ্টজেম্‌স্ হলে পাঁচ হাজার শ্রোতার সম্মুখে 'সুরাপান নিবারণ' বিষয়ে তীব্র ভাষায় এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য' বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বিলাতে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। 'যিশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম' বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া ইংরাজগণ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের এক জনসভায় একবার তাঁহাকে extempore (পূর্ব্বে প্রস্তুত না হইয়া) বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি বক্তৃতা-মঞ্চে উঠিয়া শুনিলেন বক্তৃতার বিষয় বস্তু শূন্য (nothing) তিনি এই দুরূহ বিষয়েই গবেষণাপূর্ণ এমন এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন যে সমবেত জনমণ্ডলী তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিল। তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইলে স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে আপন প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং পুস্তকাদি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগ্রন্থ কেবল বাঙ্গলা দেশেই

যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাস ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়া পাশ্চাত্য জগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্" স্বদেশীযুগে বিলাতের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের হৃদয়েও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইংরাজ কবি Grey 'Elegy' ও অন্যান্য কবিতা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন তিনি যদি একমাত্র 'Elegy' কবিতাটি ভিন্ন আর কোনও কবিতা রচনা না করিতেন তাহা হইলেও তাঁহার নাম কাব্যজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সম্বন্ধেও একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। একমাত্র এই জাতীয় সঙ্গীতের জন্যই সমগ্র বাঙ্গালীজাতি তাঁহাকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চিরদিন পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিত। বস্তুতঃ এরূপ দেশাত্মবোধপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত জগতের আর কোনও ভাষায় রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না।

বিশ্বের দরবারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। তাঁহার অমর গ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি' ইংরাজিভাষায় অনূদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যশঃ সমগ্র ইংলণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়। তৎপরে সুধীগণের বিচারে এই গ্রন্থ তদানীন্তন গীতিকাব্যগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইলে তিনি যখন 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার কবি-প্রতিভা দর্শন করিয়া সমস্ত সভ্যজগৎ তাঁহার শিরে জয়মাল্য প্রদান করে।

মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া সুধীগণ তাঁহাকে ইংরাজকবি সেক্স-পিয়ারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ সকল এখন সমগ্র জগতের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহার উদ্দেশে বলা হইয়া থাকে—

"ভারতের কালিদাস জগতের তুমি"

রবীন্দ্রনাথও 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রণয়ন করিয়া সমগ্র জগতে 'বিশ্বকবি' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

"বন্দেমাতরম্" সংবাদপত্রের স্রষ্টা পণ্ডিচেরির ঋষি অরবিন্দের নাম অধুনা সভ্যজগতে বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে তিনি যখন বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার লিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া এবং তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা, ভাবের গভীরতা ও যুক্তির সারবত্তা দেখিয়া ইংলণ্ডের পাণ্ডিতমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বিশিষ্ট সমালোচকগণ বলিয়াছিলেন তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ সকল প্রসিদ্ধ লেখক 'জন মর্লে' অথবা 'ম্যাথু আরণল্ডের' লিখিত প্রবন্ধ সকল অপেক্ষা কোনও অংশে নিম্নস্তরের নহে।* ইঁহার "Essays on the Gita" এবং "The Life Divine" অতি উচ্চস্তরের গ্রন্থ। এই পুস্তকদ্বয় প্রণয়ন করিবার

* Mr Ghosh's writing is in no way inferior to that of John Morley or Mathew Arnold.

অতি উচ্চস্তরের গ্রন্থ। এই পুস্তকদ্বয় প্রণয়ন করিবার পরে তাঁহার খ্যাতি সমগ্র সভ্যজগতে বিস্তৃত হইয়াছে। ‡

ভারতের বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। ১৯১৪—১৮ সালের বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় মহাসমর কালে সামরিক মন্ত্রণা সমিতির (War-Conference) সদস্যরূপে ইনি বিলাত গমন করেন। বিকানীরের মহারাজা তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। মহাযুদ্ধের অবসানে যখন সন্ধি বৈঠক (Peace Conference) বসে তখন ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে তিনি তাহাতে যোগদান করেন। অতঃপর ইংলণ্ডে গমন করিলে ইনি লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া সরকারি ভারত সচিবরূপে পার্লামেণ্ট মহাসভায় আসন গ্রহণ করেন। এইরূপ উচ্চপদ ও গৌরবজনক উপাধি কোনও ভারতবাসী ইতিপূর্ব্বে প্রাপ্ত হন নাই।

সমগ্র পৃথিবীতে যে সকল ভাষাবিৎ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পণ্ডিত হরিনাথ দে তাঁহাদের অন্যতম। ইনি ল্যাটিন

‡ ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে সকল অমূল্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক রোঁমা রোলা বলিয়াছেন—"Here comes Aurobinda Ghosh, the completest synthesis that has been realised to this day of the genius of Asia and of the genius of Europe.

—Romain Rolland.

ও গ্রীক ভাষায় এম, এ, পরীক্ষা দিয়া উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ কেম্ব্রিজ, জার্ম্মাণি এবং ফরাসী দেশে অবস্থান করিয়া ইউরোপীয় প্রায় সমস্ত ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ল্যাটিন ও গ্রীকভাষায় কবিতা রচনা করিয়া লর্ড চ্যান্সেলরের পদক প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত হরিনাথ পালি, বৈদিক-সংস্কৃত এবং সাধারণ সংস্কৃত ভাষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া এম, এ, পাশ করেন। তেত্রিশটি ভাষায় ইঁহার অধিকার ছিল।

খনা, লীলাবতী, গার্গী, আত্রেয়ী প্রভৃতি শিক্ষিতা প্রাচীনা মহিলাগণ একসময়ে এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এদেশকে পবিত্র করিয়াছিলেন। আজ বাঙ্গালী রমণী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু স্বীয় প্রতিভাবলে বিদেশীয়গণের নিকটেও পূজার অর্ঘ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার রচিত দুইখানি ইংরাজি কবিতা পুস্তক* ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছে। কুমারী তরু ও অরুদত্তের পরে আর কোনও বাঙ্গালী রমণী ইংরাজি কবিতা রচনায় এরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ইনি আমেরিকায় গমন করিয়া Miss Mayoর "Mother India" নামক পুস্তকের প্রতিবাদ কল্পে ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া আমেরিকার জন সাধারণ শতমুখে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

* The Golden Threshold and The Bird of Time.

সাহিত্যবিজ্ঞান প্রভৃতি কলা বিদ্যায় এবং ধর্ম্মজগতে বাঙ্গালী জাতি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাহা পাশ্চাত্য জগতের কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু সামরিক বিভাগে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় তাহাই এখন বিচার করিতে হইবে।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ চিরদিনই বাঙ্গালীকে ভীরু ও কাপুরুষ নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন-কাহিনী তাঁহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গলার কলঙ্কে" তাঁহার অখণ্ডনীয় যুক্তিদ্বারা এই কলঙ্ক দূর করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালী কি সত্যই ভীরু ও কাপুরুষ? বর্ত্তমানযুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ও স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গড়িল উপনিবেশ,
তুই কি না মাগো তাদের জননী, তুই কি না মাগো তাদের দেশ?

বাঙ্গালীবীর বিজয় সিংহ সাতশত অনুচর লইয়া জাহাজে চড়িয়া লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন, এবং এই মুষ্টিমেয় যোদ্ধার সাহায্যে লঙ্কা জয় করিয়া তথায় বাঙ্গালী জাতির জয়পতাকা উড্ডীন করেন। একথা ইতিহাস পাঠক সকলেই অবগত আছেন। বিজয়সিংহের নাম অনুসারে লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহল হইয়াছে।

বঙ্গের যে সকল বীর-সন্তান ভারতের বাহিরে গিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস তাঁহাদের অন্যতম। সুরেশচন্দ্র দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন নাই সত্য বটে, কিন্তু তিনি ১৭ বৎসর বয়সে স্বদেশ ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন এবং বিলাতে নানা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি যে শক্তি সঞ্চয় করেন, তাহা সত্যই অদ্ভূত ও চমকপ্রদ। কুলি মজুরের কাজ হইতে ফেরিওয়ালার কাজ করিয়া অনেক সময় তিনি জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি এক সার্কাসের দলে মিশিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। সামরিক বিভাগ বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করিয়া তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল গভর্ণমেণ্টের অধীনে সাধারণ সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন এবং ক্রমে কার্য্যদক্ষতাগুণে প্রথমতঃ কর্পোরাল, তৎপরে সার্জ্জেণ্ট, এবং পরিশেষে কর্ণেলের পদে উন্নীত হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল প্রদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে বাঙ্গালীবীর সুরেশচন্দ্র সিংহবিক্রমে শত্রুদলকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে।

যখন বাহুবলের যুগ ছিল, তখন এই বাঙ্গালা দেশে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়, কেদার রায় প্রভৃতি বীর সন্তানগণ প্রচণ্ড মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কিরূপে আপনাপন শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। বিখ্যাত রাজপুত সেনাপতি অম্বররাজ

মানসিংহ বঙ্গের বীর কেদার রায়কে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে তিনি সদম্ভে উত্তর দিয়াছিলেন—

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং,
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং,
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে,
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।

বঙ্গানুবাদ

করিরাজ পায় লাজ বিক্রমে যাহার,
পবনের বেগে যেই ছুটে অনিবার,
গিরি-শৃঙ্গে বাস করে সতত নির্ভয়,
তবু সিংহ পশু ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

পরিশেষে অত বড় রাজপুতবীর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে কেদার রায়ের নিকটে পরাভূত হইয়াছিলেন। এই সকল বঙ্গবীরের কীর্ত্তিকথা ভারতের বাহিরে বিস্তৃত হয় নাই, কেবল এই কারণেই যে সকল পাঠক-পাঠিকা এই প্রসঙ্গকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন তাঁহাদের নিকটে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু বীরত্বের কাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল প্রাচীন বঙ্গবীরের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াও বিচিত্র নহে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ কবির "Full many a flower is born to blush unseen" নামক লাইনটি মনে হইয়া যদি দীর্ঘশ্বাস পতিত হয় তাহা হইলেও উপায় নাই। বঙ্গের এই সকল কৃতি

সন্তানের কথা স্মরণ করিয়াই কবি ইন্দ্রনাথ তাঁহার "ভারত উদ্ধার" নামক ব্যঙ্গ কাব্যে পাঠকগণকে হাসাইতে হাসাইতে অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়াছেন—

"কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি",
অমূল্য কুসুম কত গিয়াছে ভাসিয়া,
দেখেছি নয়নে হায়, পারিনি ফিরাতে।

এখন আর বাহুবলের যুগ নাই। এখন 'সাবমেরিণ,' 'টরপেডো' এবং বিমান বহরের যুগ। এই যুগে সুভাষচন্দ্র জন্মিয়াছেন। এ যুগে আণবিক বোমা (Atom Bomb) জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত। এ হেন যুগে কর্ম্মবীর সুভাষচন্দ্র—বন্ধু-বান্ধবহীন সুভাষচন্দ্র স্বদেশ ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভারতের বাহিরে সম্পূর্ণ অপরিচিতের দেশে গিয়া সামরিক শিক্ষা লাভ করিলেন, এবং 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' ও 'ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর' ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন করিয়া প্রচণ্ড মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন—ইহা কত বড় যোগ্যতার বিষয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহার বিচার করিবেন। শুধু তাহাই নহে —এই নবগঠিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে ভারতের একটা অংশ অধিকার করিয়া তাহার উপর জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপযুক্ত সমরোপকরণ প্রাপ্ত হইলে ভারতের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ ধারণ করিত।

সুভাষচন্দ্রের জন্ম

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী দিবা ১২টা ১৫ মিনিটের সময়ে উড়িষ্যার রাজধানী কটকে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রায় জানকী নাথ বসু মহাশয় শৈশবে অতি দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া মানুষ হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুপণ্ডিত ও বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি কটকের সরকারি উকিল এবং স্থানীয় আইন ব্যবসাইদের নেতা ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বহুবৎসর কটক মিউনিসিপ্যালিটির ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মাতা শ্রীমতী প্রভাবতী বসু একজন পুণ্যশীলা আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আত্মীয় স্বজন সকলেই মুগ্ধ হইত। পুত্র কন্যাগণের চরিত্রে তাঁহার অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইত, এবং তাঁহারা সকলেই মাতাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি ও পূজা করিতেন।

জানকীবাবুর আদিনিবাস জেলা ২৪ পরগণার কোদালিয়া গ্রামে। তাঁহার আটটি পুত্র এবং ছয়টি কন্যা। তন্মধ্যে সাতটি পুত্র ও দুইজন কন্যা বর্ত্তমানে জীবিত আছেন। পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, তৃতীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু, চতুর্থ শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র বসু,

পঞ্চম ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসু, ষষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং সপ্তম শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র বসু। অষ্টম এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র সন্তোষ কুমার বসু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। জানকীবাবু তাঁহার পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষা দিবার পক্ষে কোনও ত্রুটি করেন নাই। পুত্রগণের এখানকার শিক্ষা শেষ হইলেই, জানকীবাবু তাঁহাদিগকে ইউরোপে পাঠাইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট জানকীবাবুকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন। গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতির প্রতিবাদকল্পে তিনি ঐ উপাধি পরিত্যাগ করেন। জানকীবাবু ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি কটক, পুরী, কার্সিয়ং এবং কলিকাতায় এক একখানি বাড়ী করিয়াছিলেন।

জানকীবাবুর পুত্রগণ সকলেই পরবর্ত্তী জীবনে বিভিন্নক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ব্যারিষ্টার। তিনি পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে বিপুল সংখ্যক ভোটাধিক্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মধ্যম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার এবং দেশনেতা। শরৎবাবু প্রথমতঃ উকিল হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। পরে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া কৃতিত্বের সহিত হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একজন প্রধান সহকারি হিসাবে তিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইয়াছিলেন, এবং 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার ভার লইয়া প্রথমে

রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। শরৎচন্দ্র এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু উড়িষ্যার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবিউনালের অন্যতম য্যাসেসর। চতুর্থ শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু টাটা কোম্পানির কয়লার খনির একজন বড় অফিসার। পঞ্চম সুনীল চন্দ্র বসু কলিকাতার হৃদ্‌রোগের একজন বড় হার্ট স্পেশালিষ্ট প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। সুভাষচন্দ্র মাতা পিতার ষষ্ঠ সন্তান। সপ্তম শৈলেন চন্দ্র বসু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার।

শিক্ষা

পাঁচ বৎসর বয়সে সুভাষচন্দ্রকে কটকে প্রটেষ্ট্যাণ্ট ইউরোপিয়ান স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তারপর তিনি রাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। সেই স্কুল হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি বরাবরই তাঁহার শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন।

ধর্ম্মালোচনা

সুভাষচন্দ্র ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই ধর্ম্মপ্রাণতা

তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কুল পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সুভাষচন্দ্রের এইরূপ একদল বন্ধু ছিলেন, যাঁহারা রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ অনুসারে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সুভাষচন্দ্র যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন তিনি তাঁহার অধিকাংশ সময় দরিদ্র নারায়ণের সেবায়, পীড়িতের শুশ্রূষায় এবং দুঃখীর দুঃখমোচনে ব্যয় করিতেন। তিনি রামকৃষ্ণ কথামৃত, স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং মাতার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এই সময়ে তিনি শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ শিক্ষক বেণীমাধব দাসের সংস্পর্শে আসেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের জীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

ইংরাজিতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে—"Child is the father of man" (বাল্যজীবন ভবিষ্যৎ-জীবনের আলেখ্য)। বড় হইয়া সুভাষচন্দ্র যে একজন মহামানব হইবেন, তাঁহার বাল্যকালে অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মহৎব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী বাল্যকালে মহাভারতের রাজাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী শুনিতে ভালবাসিতেন। পরিণত বয়সে তিনি একজন দিগ্বিজয়ী বীর হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ফরাসীবীর নেপোলিয়ন বাল্যকালে বরফের গোলাগুলি লইয়া কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করিতেন। পরিশেষে তাঁহার বীরত্বের কাহিনী দিগ্-

দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালার বাঘ আশুতোষের অধ্যয়ন স্পৃহা বাল্যকালে অত্যন্ত বলবতী ছিল। তাঁহার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা দমন করিবার জন্য তাঁহার পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহাকে একদিন গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিলে দেখা গেল, বালক আশুতোষ একখানি কয়লার সাহায্যে দেওয়ালে ছবি আঁকিয়া জ্যামিতির কয়েকটী দুরূহ প্রতিজ্ঞার সমাধান করিয়াছেন। বড় হইয়া তিনি গণিতশাস্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীবাবু প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। সমস্ত পরিবারবর্গের চালচলনে পূর্ণ মাত্রায় সাহেবিয়ানা বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ২৪-পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রাম জানকীবাবুর পৈত্রিক নিবাস। পূজার সময়ে জানকীবাবু সপরিবারে দেশের বাড়ীতে আসিতেন। রেলপথে আসিবার সময়ে মহিলাদের জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট লওয়া হইত। জানকীবাবু নিজে পুত্রগণকে লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু বালক সুভাষচন্দ্রের প্রকৃতি অন্য উপাদানে গঠিত ছিল। তিনি তৃতীয় শ্রেণী ভিন্ন অন্য কোনও শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে চাহিতেন না। সুতরাং তাঁহার জন্য একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিতে হইত।

বালক সুভাষের প্রথম শিক্ষা হয় প্রটেষ্ট্যাণ্ট স্কুলে। বাড়ীর ছেলেরা সকলেই সাহেবী পোষাক পরিয়া স্কুলে যাইত।

সুভাষচন্দ্রও সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া স্কুলে যাইতেন। কিন্তু এই স্কুলে বেশী দিন তাঁহার মন টিকিল না। তিনি পিতাকে অনুরোধ করিয়া কটকের রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে আসিলেন। সেখানে বাঙ্গালী, উড়িয়া, মাদ্রাজী সকলেই তাঁহার দেশের ছেলে। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ সাদাসিধা। শিক্ষকগণের শিক্ষার ধারাও জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনে জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন।

এই সংকল্প করিবার পরদিন তিনি দেশীয় পরিচ্ছদ ধুতি জামা পরিয়াই স্কুলে গেলেন। 'জানকী সাহেবের' ছেলেকে এইভাবে দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিয়া শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই বিস্মিত হইল। জানকীবাবু পরে এই ব্যাপার অবগত হইয়া সুভাষচন্দ্রকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুভাষচন্দ্র নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "বাবা, এই ত আমাদের জাতীয় পোষাক। প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলেই ত এই পোষাক প'রে স্কুলে আসেন। আমার কি উচিত সেখানে সাহেব সেজে যাওয়া?" উত্তর শুনিয়া জানকীবাবু স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আর কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। সুভাষচন্দ্রের বাল্যকাল এই ভাবেই গঠিত হইয়াছিল।

কলেজ জীবন ও সন্ন্যাস গ্রহণের চেষ্টা

ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় আসেন। এখানে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স পড়িবার সময় তাঁহার অন্তরে সন্ন্যাসগ্রহণের প্রবল প্রেরণা আসে। তিনি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন অনেক সাধুপুরুষ ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় প্রদেশে গমন করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যার ফলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই ধনীর দুলালও চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে সংসারের ভোগসুখে বীতস্পৃহ হইয়া সদ্‌-গুরুর অন্বেষণে গৃহ পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। আর্য্য ঋষিগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার আশায় বালক সুভাষ দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় একদিন সত্য সত্যই মাতাপিতা আত্মীয়স্বজনের মায়া মোহ কাটাইয়া হিমালয় অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বস্তুতঃ যে সময়ে মহাত্মা গান্ধী নবীন ব্যারিষ্টার রূপে ভারতের ধর্ম্মাধিকরণ অলঙ্কৃত করিয়া স্বীয় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন,। যে সময়ে যুবক নেহেরু হ্যারো ও কেম্ব্রিজের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে বালস্বভাবসুলভ ক্রীড়ায় সময়াতিপাত করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে এই তরুণ বালক সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। গভীর তমসাবৃত রজনীতে যখন সমগ্র জগৎ সুষুপ্ত, যখন সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ অরণ্য প্রদেশে শিকারান্বেষণে ব্যস্ত, যখন

বাত্যাবিক্ষুব্ধ নদী তরঙ্গরাশির ভীষণ গর্জ্জনে বীরপুরুষের হৃদয়ও কম্পমান, সেই সময়ে এই তরুণ সন্ন্যাসী হিমালয় প্রদেশের ভীষণ বনানী মধ্যে সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে নির্ভীকভাবে বিচরণ করিতেছিলেন।

এইরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা লইয়া এই তরুণ সন্ন্যাসী হরিদ্বার, বারাণসী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের হিন্দু মন্দির সকল দর্শন করিয়া এবং তত্রত্য সাধু মোহান্ত ও ধর্ম্মার্থিগণের জীবন যাপন প্রণালী লক্ষ্য করিয়া ছয়মাস অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু সেই সকল গৃহত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীগণের মধ্যে ভোগলালসার আতিশয্য দেখিয়া এই নবীন সন্ন্যাসী হতাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৯১৫ সালে সুভাষচন্দ্র আই-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলেজে পাঠ করিবার সময়ে সতীর্থগণের উপর তিনি তাঁহার অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি স্বামীজীকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিতেন "স্বামীজি ও আমি একই আদর্শ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। তবে তাঁহার বিষয়বস্তু—ধর্ম্ম এবং আমার বিষয়বস্তু—রাজনীতি।"

ইহার পর প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মিঃ ই, এফ, ওটেনকে প্রহার করার অপরাধে সুভাষচন্দ্র কলেজ হইতে

বিতাড়িত হন। এই সময়ে কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মঘট হয় এবং এই ধর্ম্মঘটের জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ সুভাষচন্দ্রকেই দায়ী করেন। এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সুভাষচন্দ্র কিছুদিন অধ্যয়ন কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। এই ঘটনার ফলে শাসক জাতির ব্যবহারে তাঁহার জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

১৯১৭ সালে পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃ প্রবেশ করিবার অনুমতি লাভ করেন, এবং স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে যোগদান করেন। ক্লাসের মধ্যে শেষ বেঞ্চে তাঁহার বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় ছাত্রগণ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এই অল্প সময়ের মধ্যেও তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া ময়দানে ফুটবল খেলা দেখিতে যাইতেন এবং খেলা শেষ হইলে পদব্রজে তাঁহার ভবানীপুরের বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন।

সুভাষচন্দ্র স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোর গঠিত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র এই ট্রেণিং কোরে যোগদান করেন।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন।

বিলাত যাত্রার আট মাস পরে তিনি আই-সি. এস পরীক্ষা দেন। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি চতুর্থস্থান অধিকার করেন। তিনি মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ সহ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ডিগ্রীও লাভ করেন। ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিবার সময়ে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব্ব এডুকেশন অফিসার মিঃ কে. পি. চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক কে. সি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বন্ধু ছিলেন।

একদিকে সিভিল সার্ভিসের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—অপর দিকে মাতৃভূমির আকুল আহ্বান, সুভাষচন্দ্র কোন্ পথে যাইবেন! স্বদেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র মায়ের ডাকই শুনিলেন। তিনি সিভিল সার্ভিসের লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবার সংকল্প করিলেন।

সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য্য হওয়াতে আহ্লাদিত না হইয়া বরং দুঃখিত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধুগণকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন "আমি সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য্য হওয়া সত্ত্বেও এই লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছি। কেন না আমি স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ইংরাজপ্রভু ও স্বদেশ এই উভয়কে একই সময়ে সেবা করা যখন আমার পক্ষে অসম্ভব, তখন সিভিল সার্ভিসের মোহ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ-সেবা ব্রতকেই জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিব।" এই সংকল্প

কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি ষ্টেটস্ সেক্রেটারী মিষ্টার মন্টেগুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা প্রদান করিলেন।

বেঙ্গল নেশনাল্ কলেজ

১৯৩১ সালের শেষভাগে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। অনেক ব্যবহারজীব আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তারেরা ডাক্তারি ছাড়িতেছেন এবং মহাত্মার আদেশ পালন করিবার জন্য অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্র স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছে। ছাত্রগণের শিক্ষা যাহাতে একেবারে বন্ধ হইয়া না যায়, সেজন্য কংগ্রেস অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় (National College) স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জনপ্রিয় নেতা লালা লাজপত রায় পাঞ্জাবের জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইলেন, এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। বিলাত প্রত্যাগত সুভাষচন্দ্রকে জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনা করিবার উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া দেশবন্ধু তাঁহার উপরেই এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন।

সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীরূপে যখন বিলাতে ছিলেন, তখন তিনি ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে

এবং ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা এখন দেশের কাজে লাগিল। জাতীয় কলেজের এই নবীন অধ্যক্ষ ছাত্রগণের অন্তরে স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তাহাদিগকে জাতীয় জীবনের উপযোগী করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

হরতাল

সুভাষচন্দ্রের অদ্ভুত কার্য্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর, যখন মহামান্য প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্ ভারতে আগমন করেন। তাঁহার কর্ম্মপন্থা এরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল যে সেইদিন কলিকাতা মহানগরীকে জনমানবহীন বিজন পুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। কেবল কলিকাতায় নহে—সমগ্র বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরগুলিতেও হরতাল হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় হরতাল এইরূপে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় আংলোইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় সম্প্রদায় সমূহ এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইহাকে যুবরাজের মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিলেন। জনসাধারণ স্বেচ্ছায়ই হরতাল করিয়াছিল। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ কেবল তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন—যাহাতে কোনও রূপ গোলযোগ না হয়। তথাপি আংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেস ও খিলাফৎ প্রতিষ্ঠান

প্রভৃতিকে এই হরতালের কারণ স্থির করাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট উহাদিগকে বেআইনি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কলিকাতা ও সহরতলীতে তিন মাসের জন্য জনসভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইল। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ও খেলাফৎ কমিটিকে বেআইনি ঘোষণা করিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যে আদেশ দেন, তাহার প্রতিবাদকল্পে কলিকাতার নেতৃগণ এবং কর্ম্মীগণ এক বিবৃতি বাহির করেন। ইহার পরে ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও অপর কয়েকজন নেতাকে কারারুদ্ধ করা হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি বিনাশ্রমে ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

উত্তর বঙ্গে বন্যা

১৯২২ সালে সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তি হয়। ঐ বৎসর উত্তরবঙ্গে ভীষণ জলপ্লাবন হয়। সুভাষচন্দ্র বেঙ্গল রিলিফ্ কমিটির সেক্রেটারিরূপে বন্যা প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য করিবার জন্য ঐ অঞ্চলে গমন করেন। সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে নানাস্থানে সাহায্য কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়া সহস্র সহস্র বুভুক্ষু নরনারীকে অন্নদান ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করিয়া যেরূপ কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহা তাঁহার স্বদেশবাসীর হৃদয়ে এখনও সুস্পষ্টভাবে জাগরুক রহিয়াছে। তাঁহার সেই অসাধারণ

কার্য্যদক্ষতা এবং মহান্ স্বার্থত্যাগ দর্শন করিয়া লর্ডলিটন স্বয়ং তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

স্বরাজ্য পার্টি

এদিকে মহাত্মার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন তখন দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে। "এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ আসিবে" মাহাত্মার এই বাণী দেশবাসীর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া শত শত ব্যক্তি কারাবরণ করিতেছে। ব্রিটিশরাজ কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। জনসাধারণ দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিবার আশায় পুলিশের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছে। ঠিক সেই সময়ে চৌরিচৌরার হত্যাকাণ্ড মহাত্মাকে বিচলিত করিয়া ফেলিল। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি এই মতবাদ প্রত্যাহার করিলেন। ইহার পর তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইল। দেশের লোক নেতৃহীন হইয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। ইহার প্রতীকারকল্পে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বর্গীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহিত একযোগে স্বরাজ্যপার্টি গঠন করিবার ইচ্ছা করিলেন। দেশকে প্রস্তুত করিবার জন্য 'ফরওয়ার্ড' সংবাদপত্র বাহির করিবার প্রয়োজন বোধ হইল। বাঙ্গালা দেশে স্বরাজ্যদলের নেতা হইলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষচন্দ্র হইলেন তাঁহার সহকারী বা লেপ্টেনাণ্ট।

দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীর অহিংসনীতিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু তিনি উহা সকলক্ষেত্রেই প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন না। সুভাষচন্দ্র স্বরাজ্যদলের উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিবার জন্য দেশবন্ধুর সহিত ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বলরত্ন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইতিপূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে যোগ দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিবাব জন্য তিনিও এই লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করিলেন।

ফরওয়ার্ড পত্রিকা

'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার জন্ম ও পরিচালনার সহিত সুভাষচন্দ্রের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুতঃ এই পত্রের জন্য সুভাষচন্দ্র অক্লান্তভাবে যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা সংবাদ পত্র সেবীগণেরও বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল। হোটেলে খাইয়া রাত্রিতে স্বল্পক্ষণের জন্য অফিসের টেবিলে নিদ্রা গমন করিয়া এবং দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া ১৯২৩ সালের ২৩শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র প্রথম ফরওয়ার্ড পত্রিকা বাহির করিলেন। দেশবন্ধু ও তাঁহার উপযুক্ত সহকারী সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায় "ভারতের জাতীয়তাবাদ" এর জন্মদাতা নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ এবং মিষ্টার এস. আর দাস ব্যবস্থাপক সভার সাধারণ নির্ব্বাচনে পরাস্ত

হইলেন। ডাক্তার বি সি রায় এবং শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায় যথাক্রমে তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া সহরের অধীবাসীগণকে বিস্মিত করিয়া দিলেন।

সুভাষচন্দ্রের ভাষায় কোনও আবিলতা বা অস্পষ্টতা ছিল না। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার পরিচালনকার্য্যে তিনি যে বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, সংবাদপত্রসেবীগণ চিরদিনই তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবেন। পত্র পরিচালন সম্বন্ধে চিরাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, তিনি অনেক বিষয়ে নূতন নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর বক্তৃতাগুলি তিনি ফরওয়ার্ডে এমনভাবে মুদ্রিত করিতেন, যাহাতে ইংরেজি শিক্ষিত জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ পূর্ণমাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে সংবাদপত্র সম্পাদন কার্য্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা

First C. E. O. of C. C.

অতঃপর সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার পরিচালনা এবং কর্পোরেশন নির্ব্বাচন উভয় কার্য্যেই মনোনিবেশ করিলেন। দেশবন্ধু কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র এবং মিঃ সুরাবর্দ্দী ডেপুটী মেয়র হইলেন। এখন এই প্রতিষ্ঠানের C.E.O. বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কে হইবেন তাহাই হইল সমস্যার বিষয়। সুভাষচন্দ্রের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি

আর কে থাকিতে পারে ? সুতরাং তিনি সংবাদপত্র সেবার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বা C.E.O পদ গ্রহণ করিলেন। এই পদের বেতন মাসিক ৩০০০৲ টাকা হইলেও সুভাষচন্দ্র মাত্র ১৫০০৲ টাকা বেতন গ্রহণ করিতেন। এই পদে কাহাকেও নিয়োগ করিতে হইলে বাঙ্গালা সরকারের অনুমোদন লইতে হয়। বাঙ্গলা সরকার এক মাস অতীত করিয়া সুভাষচন্দ্রের নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন ঐ পদে থাকিতে পারেন নাই। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর "বঙ্গীয় ফৌজদারি আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্স" আইন অনুসারে তাঁহাকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হইল।

সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করিবার পর, পুলিশ তাঁহার গৃহ হইতে স্বরাজ্যদলের সমস্ত কাগজপত্র এমন কি কর্পোরেশনের ফাইল পর্য্যন্ত লইয়া যায়। তাঁহাকে প্রথমতঃ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়, এবং তৎপরে বহরমপুরের জেলে পাঠান হয়। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া গভর্ণমেণ্ট পরিশেষে তাঁহাকে ব্রহ্মদেশের মান্দালাই জেলে স্থানান্তরিত করেন।

সুভাষবাবুকে কারারুদ্ধ করাতে সমগ্র দেশে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহাকে বিনাদোষে গ্রেপ্তার করায় এবং বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করায় দেশবন্ধু তাঁহার মেয়রের আসন হইতে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই

উপলক্ষে কর্পোরেশনের এক সভায় তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন "স্বদেশানুরাগী হওয়াতে আইনের চক্ষে সুভাষচন্দ্র যদি অপরাধী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমিও তাঁহার ন্যায় সমান অপরাধী"*। ফরওয়ার্ড এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের কঠোর সমালোচনা হইতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সহকর্ম্মী সুভাষচন্দ্রকে কারামুক্ত করিতে অক্ষম হওয়াতে শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের ন্যায় রুদ্ধরোষের উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে সাহায্য করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে সুভাষচন্দ্রের সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—কেন না দেশের কাজের জন্য তাঁহার নয়ন-পুত্তলী সুভাষচন্দ্রকে তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেননা। হায়! সেই সুভাষচন্দ্র আজ কারা প্রাচীরের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন শোকাবেগ সম্বরণ করিতে

* If love of country is a crime, I am a criminal. If Mr. Subhas Chandra Bose is a criminal, I am also a criminal — not ouly the Chief Executive Officer of the Corporation but the Mayor of this Corporation is equally guilty.

— The Calcutta Municipal Gazette Vol XLII No 16 P, 442.

পারিলেননা। অবশেষে তিনি একদিন সকল দুঃখ সকল অত্যাচারের পরপারে চলিয়া গেলেন।

মান্দালাইয়ে নির্জ্জন কারাবাসের ফলে এবং অত্যধিক উত্তাপের জন্য শ্রীযুক্ত বসুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তাঁহার ৪০ পাউণ্ড ওজন কমিয়া যায় ও ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুভাষ চন্দ্রের ভ্রাতা বিখ্যাত ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসু ও সরকারি মেডিকেল অফিসার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করেন যে তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক! ১৯২৭ সালের এপ্রেল মাসে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। তাঁহার তৎকালিন শারীরিক অবস্থা দেখিয়া সরকারি ডাক্তার এরূপ মন্তব্য করিয়া-ছিলেন যে তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে ইউরোপে পাঠান হউক। যাহা হউক ১৯২৭ সালের ১৫ই মে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হয়।

সুভাষচন্দ্র যখন কারাগারে ছিলেন তখন কলিকাতা কর্পো-রেশন ১৯২৭ সালের ১২ই মে পর্য্যন্ত তাঁহার ছুটি মঞ্জুর করেন। এই ছুটির কাল শেষ হইলে মিঃ জে, সি, মুখার্জিকে স্থায়ীভাবে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়। ঠিক ইহার তিন দিন পরে অর্থাৎ ১৫ই মে তারিখে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তিদান করেন।

মুক্তিলাভের পর সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় স্বনামধন্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার রায়ের সুচিকিৎসায় সুভাষচন্দ্র অনতিবিলম্বে সুস্থ ও সবল

হইলেন এবং দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, যে শক্তিতে শক্তিমান হইয়া একদিন তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন, দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে তাঁহার সেই শক্তি মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মুহূর্ত্তের এই দুর্ব্বলতা শীঘ্রই দূর হইল। এতদিন তিনি সংসারের ঘোর আবর্ত্তনে পতিত হইয়া যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব এখন বুঝিতে পারিলেন। ধনীর সন্তান হইয়াও তিনি কিশোর বয়স হইতেই দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। জন্ম-ভূমির দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য, আর্ত্তের সেবা করিবার জন্য অনশন, অর্দ্ধাশন এবং অনিদ্রা তাঁহার চিরসাথী হইয়াছিল। পথশ্রমে তিনি কোনও দিনই ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। দিনের পর দিন পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া তিনি বিপদসঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছেন। তথাপি তিনি স্বদেশ সেবায় বিরত হন নাই। সুতরাং আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

মনেরভাব ভাষায় ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার কিরূপ অসাধারণ ছিল, কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কংগ্রেস স্বরাজের প্রার্থী ছিলেন বটে, কিন্তু স্বরাজের প্রকৃত অর্থ কি এতদিন কেহই তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষ-চন্দ্রই প্রথম বুঝাইয়া দিলেন যে "স্বরাজের" অর্থ "স্বাধীনতা" এবং কংগ্রেসকে এই অর্থ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী অনুমোদন না করাতে কলিকাতা কংগ্রেস এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে মহাসমিতি সুভাষচন্দ্রের অর্থই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন।

G. O. C. (General Officer Commanding)

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসের ত্রিচত্বারিংশৎ অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হইলেন। কলেজে পড়িবার সময়ে ইউনিভার্সিটি ট্রেণিং কোরে যোগদান করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা এই সময়ে তাঁহার কাজে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদের যোদ্ধৃবেশ এবং কুচকাওয়াজ দর্শনে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তিও ব্যঙ্গাত্মক তুলনা করিয়াছিলেন। এদেশের একদল লোকও বহুদিন পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে জেনারেল কম্যাণ্ডিং অফিসারের অপভ্রংশ গক্ (G. O. C.) নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অপরপক্ষে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সমরনায়কের বেশ বিশেষ করিয়া তরুণ সম্প্রদায়ের চিত্তপটে যে চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার সদ্য গঠিত আজাদ হিন্দবাহিনীর ইতিহাসের সহিত জড়িত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে সহস্রগুণ মহিমাময় হইয়া উঠিয়াছে।

মহাত্মার বিরুদ্ধাচরণ

কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর আপোষ রফামূলক প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন "স্বাধীনতা আমরা চাই, এ স্বাধীনতা আমাদের সুদূর ভবিষ্যতের আদর্শ নহে, বর্ত্তমানেই আমাদের দাবী স্বাধীনতা।" * তিনি আরও বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালাদেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হইতেই আমরা স্বাধীনতা অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতাই বুঝিয়াছি—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন কখনই বুঝি নাই। আমাদের বহু দেশবাসীর আত্মবিসর্জ্জনে আমরা স্বাধীনতার অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতাই বুঝিয়াছি। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের কথায় আমাদের দেশবাসীর মনে—বিশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায়ের মনে কিছুমাত্র সাড়ার সৃষ্টি হইবে না।" এই অধি-বেশনে তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি পরে পণ্ডিত জহরলাল ও শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ স্বাধীনতাবাদী নেতৃগণকে লইয়া "নিখিলবঙ্গ স্বাধীনতা সঙ্ঘ" গঠন করেন। পূ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করাই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল।

১৯২৭ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ও নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি নেহেরু কমিটির

*We stand for indipendence not in the distant future, but as our immediate objective.

The Calcutta Municipal Gazette Vol XLII No 16 P 422.

সভ্যও হইয়াছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৯২৯ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় কাউন্সিল নির্ব্বাচনে কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে পরিচালনা করেন। এপ্রেল মাসে কাউন্সিল ভঙ্গ হয় এবং অধিকাংশ কংগ্রেস কর্ম্মী বিনা বাধায় কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

নিখিল ভারত রাজনীতিক লাঞ্ছিত দিবস

১৯২৯ সালের আগষ্ট মাসে "নিখিলভারত রাজনীতিক লাঞ্ছিত দিবস" উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ কলিকাতায় এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক অপরাধে লাঞ্ছনাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই উপলক্ষে সুভাষবাবু, শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত হয়। সুভাষচন্দ্র আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ হয়। পরিশেষে ১৯৩০ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে আদালতের বিচারে তাঁহার প্রতি নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

সহীদ যতীন দাসের মৃত্যু

১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী যতীন্দ্রনাথ দাস লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ৬৩ দিন অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শবদেহ লাহোর হইতে কলিকাতায় আনীত হয়। এই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র যে বিরাট শবযাত্রার আয়োজন করেন, সেরূপ শবযাত্রা এক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষেই দেখা গিয়াছিল।

ছাত্র সম্মেলন

১৯২৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু হাওড়া রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯শে অক্টোবর তিনি পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি হন। ১লা ডিসেম্বর তারিখে অমরাবতীর ছাত্র সম্মেলনেও সভাপতিত্ব করেন!

১৯২৯ সালের ১লা ডিসেম্বর লাহোরে জাতীয় মহাসমিতির ৪৪ তম অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীযুক্তবসু পূর্ণ স্বাধীনতাই স্বরাজের অর্থ বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু কলিকাতা অধিবেশনের ন্যায় বর্ত্তমান অধিবেশনেও তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

বেঙ্গল স্বদেশী লিগ

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র "বেঙ্গল স্বদেশী লীগ" নামক সমিতি গঠন করেন, এবং তিনি নিজেই ইহার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস ইহার ভাইস্ প্রেসিডেন্ট, শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় জেনারেল সেক্রেটারি এবং শ্রীযুক্ত আনন্দজি হরিদাস কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট এই লীগের কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি, শিল্পের উন্নতি, স্বদেশী প্রচার প্রভৃতি দেশের মঙ্গলকর কার্য্যই এই লীগের কর্ম্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৩১ সালে তাঁহার সম্পাদনায় এই লীগ হইতে "স্বদেশী ও বয়কট্" নামে ইংরাজি বুলেটীনও প্রকাশিত হইয়াছিল।

অল্ডার ম্যান ও মেয়রের আসনে সুভাষচন্দ্র

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত অন্তরীণ অবস্থায় থাকায় ১৯৩০ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি তখনও কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে মুক্তিদান করেন। পরদিন তিনি অল্ডার ম্যানের শপথ গ্রহণ করেন এবং মেয়র পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনে এবং কলিকাতার নাগরিকগণের

মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনার সঞ্চার হয়। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সভাসমিতি হয়। সুভাষচন্দ্র যে কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন, কলিকাতার অধিবাসীগণ সেদিন তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

গোলটেবিল বৈঠক

১৯৩০ সালের ১৩ই নভেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র এই সভার সভাপতি ছিলেন। ঐ ১৩ই নভেম্বর তারিখেই লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্বদলের প্রতিনিধি লইয়া উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নাই—ইহাই ছিল বর্ত্তমান সভার আলোচনার বিষয়।

উত্তর বঙ্গ পরিভ্রমণ

১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র উত্তর বঙ্গ পরিভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি মালদহে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তত্রত্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে তাঁহার উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই আদেশ অমান্য করাতে সুভাষচন্দ্রের উপর ৭ দিন বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে সুভাষ বাবু বোম্বাই গমন করেন। ২০শে মার্চ্চ তারিখে তিনি নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির করাচী অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান পদে ইস্তফা প্রদান করেন।

এই বৎসর অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত বসুর উপর ১৪৪ ধারা অনুসারে দুইবার আদেশ জারি করা হয়। তিনি দুইবারই গভর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেন।

১৯৩১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের নিকট হইতে সুভাষচন্দ্র এক আমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হন। এই অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলাপ আলোচনা শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার পথে কল্যাণ ষ্টেশনে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ রেগুলেসন অনুসারে পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েক মাস কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকিবার পরে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভঙ্গ হয়। একারণ ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহার চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাত্রার অনুমতি দেন এবং তাঁহাকে মুক্তি দান করেন। ১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন,

এবং ৮ই মার্চ্চ তারিখে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরে উপস্থিত হন।

ভিয়েনায় অবস্থিতি।

সুভাষ চন্দ্র স্বাস্থ্যলাভের আশায় ভিয়েনা সহরে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ একটি স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করেন। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মিঃ বিটলভাই পেটেল চিকিৎসার জন্য ইতিপূর্ব্বে ভিয়েনায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বসু ভিয়েনায় পৌঁছিবার পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে মিষ্টার পেটেল অধিকাংশ বিষয়েই সুভাষ বাবুর সহিত একমত ছিলেন। তিনি সুভাষ বাবুকে সকল বিষয়ে উপযুক্ত মনে করিয়া বিদেশে ভারতের স্বপক্ষে জনমত সংগ্রহের জন্য এবং প্রচার কার্য্যের জন্য তাঁহার নামে এক লক্ষ টাকা উইল করিয়া গিয়াছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত মিঃ পেটেলের সহিত সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে সুভাষ বাবু তাঁহার শবদেহ ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

জানকী বাবুর মৃত্যু।

সুভাষবাবু ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ হইতে ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল ইউরোপে ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের

মধ্যে তিনি তাঁহার পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া অল্পদিনের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে সুভাষবাবুর পিতা জানকী নাথ বসু মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই সংবাদ পাইয়া সুভাষবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে আকাশপথে ইউরোপ হইতে করাচী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। করাচীতে পৌঁছিয়াই তিনি শুনিলেন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এবং মৃত্যুকালে পিতার দর্শনলাভে বঞ্চিত হওয়াতে সুভাষচন্দ্র মর্ম্মাহত হইলেন।

শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। দমদম এইরোড্রোমে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইল যে তাঁহাকে তাঁহার এলগিন রোডের বাড়ীতে বন্দীভাবে থাকিতে হইবে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইবে। পরিশেষে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্য্যন্ত তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন।

পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান শেষ করিয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র পুনরায় ইউরোপে গমন করেন। ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এমন একটি রোগে আক্রান্ত হন যে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করিবার আবশ্যক হয়।

সুবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার ড্যামিয়েল এই অস্ত্রোপচার কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। এই সময়ে তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একখানি ইতিহাস (History of the Indian National Movement) লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কঠোর মানসিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম হওয়ায় তিনি এই গ্রন্থ শেষ করিতে পারেন নাই। তাঁহার Indian struggle বা ভারতীয় সংগ্রাম নামক অমূল্য গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বেই লণ্ডন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই পুস্তক খানির ভারতে আগমন নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সুভাষচন্দ্র ইউরোপের কয়েকটি সভা সমিতিতে যোগদান করিয়া এবং আয়ার্ল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় ভিয়েনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সুভাষবাবু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভারতে আসিয়া কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে যোগদান করিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তিনি ভিয়েনার ব্রিটিশ কন্সালের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাইলেন যে তিনি ভারতে ফিরিয়া স্বাধীন জীবন যাপন করিতে সমর্থ

হইবেন এমৎ সম্ভাবনা নাই। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই ভীতি প্রদর্শনে সুভাষচন্দ্র বিন্দুমাত্র সংকল্পচ্যুত হইলেন না। তিনি নির্দ্ধারিত সময়ে ভিয়েনা পরিত্যাগ করিলেন এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল বোম্বাই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলেন। বন্দরে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৮ সালের ৩নং রেগুলেসন অনুসারে পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং যারবেদা জেলে অবরুদ্ধ করা হইল। ভারতের বিভিন্ন কারাগারে কিছুদিন রাখিবার পর তাঁহাকে শরৎবাবুর কার্সিয়ংস্থিত বাটীতে অন্তরীণ করা হয়। তাঁহাকে এইরূপ অবৈধভাবে গ্রেপ্তার করাতে দেশমধ্যে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ১০ই মে "নিখিলভারত সুভাষ-দিবস" উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র ইহার প্রতিবাদ-কল্পে সভা সমিতি হইল।

কারা মুক্তি ও ইউরোপ যাত্রা

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় সুভাষবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এবং ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাসে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। তাঁহার মুক্তিতে সমগ্র দেশে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক মহতী সভার আয়োজন করিয়া এই জনপ্রিয় নেতার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

মুক্তিলাভের পর কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমতঃ

ডাক্তার নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীনে থাকেন। ২৫শে এপ্রেল স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি পাঞ্জাবের ডালহৌসি সহরে গমন করেন। পাঁচ মাস কাল তথায় অবস্থান করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়। তথাপি ডাক্তারের পরামর্শানুসারে পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য তিনি কলিকাতা হইতে কার্সিয়ং যাত্রা করেন এবং এক পক্ষকাল তথায় অবস্থানের পর তিনি কলিকাতায় আসেন। ১৯৩৭ সালের ১৬ই নভেম্বর তারিখে স্বাস্থ্যলাভের আশায় সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে ইউরোপ যাত্রা করেন। তিনি ৬ সপ্তাহ কাল অষ্ট্রীয়ায় থাকিয়া সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হন। পরে তথা হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন। লণ্ডনে পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। লণ্ডনে অবস্থান কালে মিষ্টার বসু আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ নেতা মিষ্টার ডি ভ্যালোরার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি

হরিপুরা অধিবেশন

সুভাষবাবু ইউরোপ প্রবাসকালে যে সময়ে ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে জাতীয় মহাসমিতির একপঞ্চাশত্তম অধিবেশন হরিপুরায় অনুষ্ঠিত হইবে এইরূপ স্থির হয়। সুভাষবাবু এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি ভারতে

আসিয়া ১৯৩৮ সালে এই অধিবেশনে যোগদান করেন এবং একটি সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন। এই অভিভাষণে তাঁহার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রিপুরী অধিবেশন

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ত্রিপুরী অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু সুভাষবাবুর জনপ্রিয়তা এরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল যে বিপুল সংখ্যক ভোটে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি পদে মনোনীত হইলেন। দুঃখের বিষয় সুভাষবাবুর এই বিজয় মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নির্ব্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ ত্রিপুরী অধিবেশন উপলক্ষে মহাত্মার আশ্রয়-পুষ্ট কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের সদস্যগণ সুভাষবাবুর যেরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা কংগ্রেসের ইতিহাসকে চিরদিন কলঙ্ক কালিমায় আবৃত করিয়া রাখিবে। এমনকি মহাত্মা গান্ধীর আচরণেও এই বাঙ্গালী-বিদ্বেষ যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা বঙ্গবাসী এখনও ভুলিতে পারে নাই।

সুভাষবাবু ৫ই মার্চ্চ তারিখে অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতা হইতে

ত্রিপুরী যাত্রা করেন। ১০ই মার্চ্চ ত্রিপুরী কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশন হয়, কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীযুক্ত বসু এই অধিবেশনে যোগদান করিতে অসমর্থ হন।

ত্রিপুরী কংগ্রেস

সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ

বন্ধুগণ, কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা মেঘাচ্ছন্ন। কংগ্রেসের মধ্যে নানা বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য আমাদের বহু বন্ধু নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু আমি অত্যন্ত আশাবাদী—যে মেঘ আজ দেখা দিয়াছে, তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে। দেশবাসীর দেশপ্রেমের উপর আমার প্রবল বিশ্বাস আছে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে অচিরে আমরা বর্ত্তমান বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া উঠিতে পারিব এবং আমাদের দলসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইব।

১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের সময় অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পরই পুণ্যশ্লোক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং পণ্ডিত মতিলাল নেঁহেরু স্বরাজ্যদল স্থাপন করেন। তাঁহাদের স্মৃতি এবং ভারতের অন্যান্য বীরসন্তান এই সঙ্কটে আমাদের অনুপ্রাণিত করুন এবং আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা মহাত্মা গান্ধী

কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিস্থিতি দূর করিয়া আমাদের জাতিকে পথ প্রদর্শন করুন।

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের পর আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে মিউনিক চুক্তি হয়, তাহা বিশেষ জরুরী। ঐ চুক্তিতে ফ্রান্স ও গ্রেটব্রিটেন হীনভাবে নাৎসী জার্ম্মাণির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ফলে ফ্রান্সের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, আর জার্ম্মাণি বিনা অস্ত্রে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি গণতান্ত্রিক স্পেনের পতনে ফ্যাসিষ্ট ইতালিও নাৎসি জার্ম্মাণির শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্র হইতে আপাততঃ সোভিয়েট রুশিয়াকে মুছিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্রে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ফ্রান্স ও গ্রেট-ব্রিটেন ইটালি ও জার্ম্মাণির সহিত যোগ দিয়াছে। কিন্তু রুশিয়াকে কতকাল দাবাইয়া রাখা সম্ভব হইবে এবং রুশিয়াকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় ফ্রান্স ও গ্রেটব্রিটেনের কি লাভ হইয়াছে? সম্প্রতি ইউরোপ ও এশিয়ায় যে সকল আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও মর্য্যাদা যথেষ্ট খর্ব্ব হইয়াছে।

এখন আমাদের স্বদেশের রাজনীতি আলোচনা করা যাউক। আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া আমি কয়েকটি জরুরী সমস্যার মাত্র উল্লেখ করিব।

গত কিছুদিন যাবৎ আমি বোধ করিতেছি যে এখন আমাদের

স্বরাজের দাবি উত্থাপন করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে চরম পত্র দেওয়া কর্ত্তব্য। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিবার নীতি অবলম্বনের সময় বহু পূর্ব্বে গত হইয়াছে। কখন আমাদের উপর যুক্তরাষ্ট্র চাপান হইবে, এখন আর আমাদের সমস্যা নহে। ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইবার আশায় যদি কয়েক বৎসর যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন স্থগিত রাখা হয়, তবে আমরা কি করিব উহাই এখন সমস্যা। চতুঃশক্তি চুক্তি দ্বারাই হউক, আর অপর কোন উপায়েই হউক, যদি একবার ইউরোপে স্থায়ী শক্তি স্থাপিত হয়, তাহা হইলেই গ্রেটবৃটেন যে কঠোর সাম্রাজ্য-নীতি অবলম্বন করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেকে দুর্ব্বল বলিয়া বোধ করিয়াই বৃটেন প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদিগের প্রতিকূলভাবে আরব-দিগকে শান্ত করিবার চেষ্টার আভাষ দিতেছে। অতএব আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর চাহিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট চরম পত্র দেওয়া উচিত। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন উত্তর না পাওয়া যায়, কিম্বা প্রাপ্ত উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় দাবি পূরণের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সেই ব্যবস্থা হইতেছে আইন অমান্য সত্যাগ্রহ। আর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এখন সর্ব্বভারতীয় সত্যাগ্রহের ন্যায় বৃহৎ সঙ্ঘর্ষের সম্মুখীন হইতে পারিবেন না।

আমি দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, কংগ্রেসে এমন লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরাট

আন্দোলন আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। বিষয়টি আমি বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও নৈরাশ্যের অণুমাত্র কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। আটটি প্রদেশে শাসন ক্ষমতা লাভ করায় আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটিশভারতে গণ আন্দোলন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহেও অভূতপূর্ব্ব জাগরণ দেখা দিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিও আমাদের অনুকূল। এতদবস্থায় স্বরাজ লাভের পথে চুড়ান্তভাবে অগ্রসর হইবার আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ইহার চেয়ে আর কি সুসময় উপস্থিত হইতে পারে ?

আমি স্থির মস্তিস্ক বাস্তববাদী হিসাবে বলিতে পারি, বর্ত্তমান পরিস্থিতি আমাদের এত অনুকূল যে এখনই সাফল্যের সর্ব্বাধিক আশা পোষণ করা উচিত। আমরা যদি কেবল ভেদ ও বাদ বিসম্বাদ বিসর্জ্জন দিয়া জাতীয় আন্দোলনে আমাদের সমগ্র শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করি তাহা হইলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অপ্রতিহত আক্রমণ চালাইতে পারিব। বর্ত্তমান সুযোগ-পূর্ণ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিব অথবা জাতীয় জীবনের দুর্লভ সুযোগ হেলায় হারাইব।

দেশীয় রাজ্যসমূহে জাগরণের কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি। আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে আমরা হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবে যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি, তাহা

পরিবর্ত্তন করা উচিত। উক্ত প্রস্তাবে কংগ্রেসের নামে দেশীয় রাজ্যসমূহে কোন কোন কাজ চালান নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদনুসারে দেশীয় রাজ্যসমুহে কংগ্রেসের নামে পার্লামেণ্টারি কার্য্য কিম্বা আন্দোলন চালানো যাইবে না। কিন্তু কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন আমরা দেখিতেছি যে সার্ব্বভৌম শক্তি অধিকাংশ স্থানেই দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত একজোট হইয়াছে। এই অবস্থায় দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হওয়া উচিত নহে কি? বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য কি তৎসম্বন্ধে আমার মনে কোনও সন্দেহ নাই।

দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইতে হইবে। তাহা ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটিকে ব্যাপক ও প্রণালীবদ্ধ উপায়ে দেশীয় রাজ্য সমূহে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র লাভের জন্য আন্দোলন চালাইতে হইবে। দেশীয় রাজ্যে এযাবৎ কেবল বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করা হইয়াছে, কোন পদ্ধতি বা পরিকল্পনা অনুসারে হয় নাই। এখন ওয়ার্কিং কমিটিকে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া ব্যাপক ও প্রণালীবদ্ধ আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে এতদুদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাবকমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কার্য্যে মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ ও সহযোগিতা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। নিখিলভারত দেশীয় রাজ্য-প্রজা সম্মেলনের সহযোগিতা ও লইতে হইবে।

স্বরাজলাভের জন্য যে আমাদিগের চূড়ান্তভাবে অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত, তাহা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তজ্জন্য যথেষ্ট আয়োজন দরকার। প্রধানতঃ ক্ষমতার লোভে আমাদের মধ্যে যে দুর্নীতি ও দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, প্রথমতঃ নির্ম্মম হস্তে তাহা দূরিভূত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের দেশের কিষাণ-আন্দোলন, ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া মিষিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দেশের সর্ব্বপ্রকার চরমপন্থী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চালাইবার জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলিকে একযোগে অগ্রসর হইতে হইবে।

বন্ধুগণ আজ কংগ্রেসের ভিতরে কলহের মেঘ দেখা দিয়াছে। এই কারণে আমাদের বহু বন্ধু নিরুৎসাহ বোধ করিতেছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই নিরাশ হই না, আমাদের দেশবাসীর স্বদেশ-প্রেমে আমার বিশ্বাস আছে। আমার দৃঢ় ধারণা অচিরেই আমরা এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারিব। আমাদের মধ্যে পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। বন্দেমাতরম্।'

মাসিক বসুমতী মাঘ, ১৩৫২

ফরওয়ার্ড ব্লক

কংগ্রেসের সভাপতি-নির্ব্বাচন এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে সদস্যগণের মধ্যে যে মতভেদ হয়, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কংগ্রেসের মধ্যে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হয়। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও সুভাষচন্দ্রের আদর্শের বিভিন্নতা ও সুভাষচন্দ্রকে বিচলিত করিয়া তুলিল। মহাত্মা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গরূপেই ভারতের নূতন শাসন-পদ্ধতি রচনা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এই সকল কারণে সুভাষচন্দ্র ২৯শে এপ্রেল তারিখে কলিকাতার নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে কংগ্রেসের সভাপতিপদ পরিত্যাগ করিলেন এবং ফরোয়ার্ড ব্লক, গঠন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

অন্ধকূপ-হত্যা স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ

মিষ্টার হলওয়েল "অন্ধকূপ-হত্যা" কাহিনী দ্বারা ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই কলঙ্ক-কাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কলিকাতা মহানগরীর বক্ষে লালদীঘির নিকটে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমান রাজগণ যে কিরূপ নিষ্ঠুর ছিলেন তাহারই একটি চিত্র ভারতবাসীর সম্মুখে স্থাপন করাই এই স্তম্ভ স্থাপনের উদ্দেশ্য।

অপরাধীদিগকে দণ্ডস্বরূপ অবরুদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত ইংরাজদিগের কলিকাতাস্থ দুর্গে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। গৃহটি দৈর্ঘ বিস্তারে বারহাতের অধিক ছিল না এবং তাহাতে দুইটি মাত্র গবাক্ষ ছিল। ঐতিহাসিক মিষ্টার হলওয়েল লিখিয়া গিয়াছেন, সিরাজের সৈন্যগণের নিকট পরাজিত হইয়া অন্যান্য ইংরাজগণ পলায়ন করিবার পরে, দুর্গে যে অল্পসংখ্যক ইংরাজ ছিলেন তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করেন। ইহার পরে ১৪৬ জন ইংরাজকে নবাবপক্ষের জনৈক সেনানায়ক সিরাজের অজ্ঞাতসারে উপরোক্ত গৃহে একরাত্রির জন্য অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল বন্দীগণের মধ্যে ২৩জন মাত্র জীবিত আছেন।

বহুদিন পর্য্যন্ত এই ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোনও বাঙ্গালী গবেষণা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে ঘটনাটি কল্পনা-প্রসূত এমন কি কেহ কেহ এই সঙ্কীর্ণ গৃহের আয়তন এবং এক একজন মনুষ্যের সাধারণ আয়তনের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে এই অল্পায়তন গৃহে কোনও মতেই ১৪৬ জন লোকের স্থান হইতে পারে না, তখন দেশবাসিগণ এই কাহিনীকে আর ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। মহানগরীর বক্ষ হইতে ইহার অপসারণের জন্য অনেক চেষ্টাও হইল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

পরিশেষে সুভাষচন্দ্র রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। এই নির্ভীক তেজস্বী পুরুষ তাঁহার সমগ্র জীবনে কখনও কোন অবিচার সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি সকল ক্ষেত্রেই ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ কল্পে তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাঙ্গালী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। সুতরাং এই আন্দোলনে হিন্দুমুসলমান সকলেই তাঁহার অনুগামী হইল। হিন্দুমুসলমানগণ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়া দিনের পর দিন কারাবরণ করিতে লাগিল। ভারত রক্ষা আইনানুসারে সুভাষবাবু অবশেষে কারারুদ্ধ হইলেন। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তিনি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

সুভাষবাবুকে হারাইয়াও দেশবাসিগণ এই সত্যাগ্রহ ভঙ্গ না করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তরীভূত বিরাট অসত্যের স্তম্ভকে মহানগরীর বক্ষ হইতে অপসারিত করিলেন।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য
ও
কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান।

সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার দেশবাসীগণ এইরূপ শ্রদ্ধা করিতেন যে তিনি কারারুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাকে ব্যবস্থাপক

সভার সদস্য মনোনীত করিলেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান ও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

রাজনৈতিক ইচ্ছাপত্র।

বা

Political Testament

হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবুকে কারারুদ্ধকরিয়া রাখিবার আর কোন প্রয়োজন নাই বুঝিতে পারিয়াও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তিদান করিলেন না। ইতিপূর্ব্বে তিনি মহম্মদ আলি পার্কে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় 'হিসাব নিকাশের দিন' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই উভয়ই রাজদ্রোহ সূচক আখ্যা দিয়া ভারত রক্ষা আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

সুভাষবাবু এই অবরোধ অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। যদিও তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অন্যায় আদেশের প্রতিবাদকল্পে অনশন ধর্ম্মঘট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এই আত্মঘাতী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ১৯৪০ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে তিনি বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুর, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা ভারতের

ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি এই পত্রকে "Political Testament" বা রাজনৈতিক ইচ্ছাপত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই পত্রের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"এই পত্রে আমি আমার আত্মকাহিনী সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব, এবং যে কারণে আমি এই আত্মঘাতী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি তাহাও লিপিবদ্ধ করিব।"

"আমার অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের নিকট যে কোন প্রতীকার পাইব, আমার এরূপ আশা নাই। সুতরাং আমি আপনাদিগকে তুইটি অনুরোধ করিব। আমার প্রথম অনুরোধ এই যে আপনারা আমার এই পত্রখানি গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় সযত্নে রক্ষা করিবেন। আমার দেশবাসিগণ—যাঁহারা আপনাদের উত্তরাধিকারী হইবেন, তাঁহারা যেন প্রয়োজন হইলে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। আমি তাঁহাদের জন্য এই অন্তিমকালীন সংবাদ রাখিয়া যাইতেছি। ইহাকে আমার "Political Testament" বা রাজনৈতিক ইচ্ছাপত্র আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

আমার সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে আইন-বিরুদ্ধ ও অসঙ্গত কার্য্য করিতেছেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য আমি এই বুঝিতে পারিয়াছি যে তাঁহারা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়াই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্রতিহিংসা-পরায়ণতার কারণ কি তাহা আমার নিকট দুর্ব্বোধ্য রহিয়াছে। এতাদৃশ সঙ্কটাপন্ন

অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি আমার অন্তঃকরণকে আমি বার বার এই প্রশ্ন করিতেছি। আমার অদৃষ্টে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহাই কি আমি মানিয়া লইব? অথবা অন্যায় অসঙ্গত এবং আইন-বিরুদ্ধ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিব? অনেক চিন্তা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে এই সকল প্রতিকূল অবস্থার নিকটে বশ্যতা স্বীকার করা আমার পক্ষে কোনও মতে সম্ভবপর নহে। এই সকল নীতি-বিরুদ্ধ ও আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে যে পরিমাণে ধর্ম্মহানি হইতে পারে, ইহাদিগকে মানিয়া লইলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর মহাপাতকের সঞ্চার হইবে। সুতরাং ইহার প্রতিবাদ আমাকে করিতেই হইবে।

কিন্তু আমি এতদিন যে ভাবে প্রতিবাদ করিয়াছি, তাহা আমার অরণ্যে রোদন করা হইয়াছে। সংবাদ পত্রে আন্দোলন, বক্তৃতা মঞ্চ হইতে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন, গভর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন নিবেদন, ব্যবস্থাপক সভায় অশেষবিধ দাবির উল্লেখ প্রভৃতি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও আমি সুফল লাভ করিতে পারি নাই। এখন আমার পক্ষে একটি মাত্র পথ উন্মুক্ত আছে—তাহা হইতেছে—অনশন ধর্ম্মঘট।

অনশন অবলম্বন করিলে কি লাভ হইবে তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। অনশন অবলম্বন করিয়া ব্রিটিশগভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমি যে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবনা তাহাও আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। সুতরাং অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া আমি লাভবান হইবনা ইহাও একপ্রকার সুনিশ্চিত।

Terence Macswiney এবং যতিনদাসের দৃষ্টান্ত আমি মানস নেত্রে অবলোকন করিতেছি। আমি বিশেষরূপেই অবগত আছি হৃদয়হীনতা ও মিথ্যা আত্ম-সম্মান বোধ ভিন্ন সেখানে আর কিছুই নাই।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমার জীবন দুর্ব্বিসহ বোধ হইতেছে। বিধিবিরুদ্ধ বা আইন-বিরুদ্ধ কার্য্যের সহিত আপোষ মীমাংসা করিয়া কোনওমতে নিজের সত্বাকে বজায় রাখা আমার প্রবৃত্তির একেবারেই বিরুদ্ধে। এরূপ মূল্য দিয়া জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই আমি শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি। গভর্ণমেণ্ট পাশবিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, ইহার প্রতিবাদ কল্পে আমি বলিতে চাই, আমাকে মুক্তিদান করা হউক, নতুবা আমি মৃত্যুকে বরণ করিব। আরও বলিতে চাই যে আমার জীবন মরণ সমস্যা আমি নিজেই সমাধান করিব।

এইরূপভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিলে আপাততঃ কোনও লাভ হইবেনা একথা সত্য বটে ; কিন্তু স্বার্থত্যাগ মাত্রেরই একটা সুফল আছে। একমাত্র স্বার্থত্যাগ ও আত্ম-বলিদান করিতে পারিলেই এক একটি মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে—ইহা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই একটি চিরন্তন সত্য। যাহারা ধর্ম্মার্থে জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহাদের রক্তবিন্দুর উপরেই ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই নশ্বর জগতে সকল পদার্থই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু

সংস্কার বা আদর্শের ধ্বংশ নাই। একজন আদর্শবাদীর মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরে সেই আদর্শ সহস্র সহস্র ব্যক্তির অন্তরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশের চক্র এইরূপেই ঘূর্ণায়মান হয় এবং পূর্ব্বপুরুষের ভাবধারা এইরূপেই পরবর্ত্তী পুরুষে সংক্রমিত হইতে থাকে। অশেষ দুঃখ কষ্ট এবং জীবন-ব্যাপী স্বার্থত্যাগের অগ্নিপরীক্ষার দ্বারাই এক একটি ভাবধারা পরিস্ফুট হইয়া সুফল প্রসব করে।

কোন একটি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সমগ্র জীবন অতিবাহিত করা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করা অপেক্ষা মানবের অধিকতর সান্ত্বনার বিষয় আর কি থাকিতে পারে? দেহাবসান হইলেও আত্মা জীবনের অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য সমজাতীয় কতকগুলি আত্মার সৃষ্টি করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি আর কিসে হইতে পারে? প্রেরিত সংবাদ নদনদী পর্ব্বত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া জন্মভূমির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হইবে, এমন কি বিশাল বারিধিবক্ষ লঙ্ঘন করিয়া বিদেশীয়গণের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মবলিদান করা অপেক্ষা মানবের আর কিছু কাম্য থাকিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।

এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে জীবনব্যাপী দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া অথবা আত্মপ্রাণ বলি দিয়াও কোনও ব্যক্তি

ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। পার্থিব জীবনে হয়ত তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে অমর জীবন লাভ করিয়া সেই ব্যক্তি শত সহস্রগুণে লাভবান হইতে পারে। ইহাই আত্মার বিশেষত্ব। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে ব্যক্তিগত জীবন বলি দিতে হইবে। ভারত বাঁচিয়া থাকিবে এবং স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিবে এই আশায় আজ আমাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।

উপসংহারে আমি আমার স্বদেশবাসীগণকে আমার অন্তিম কালের এই বাণী প্রেরণ করিতেছি—

হে ভ্রাতৃগণ! ভুলিওনা দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিয়া জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকার ন্যায় অভিশাপ জগতে আর কিছুই নাই।

ভুলিওনা—অন্যায় ও অবিচারের সহিত আপোষ মীমাংসা করিয়া বাঁচিয়া থাকার ন্যায় হীন ও জঘন্য অপরাধ জগতে আর কিছুই নাই।

স্মরণ রাখিবে—মূল্যবান কিছু লাভ করিতে হইলে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পদার্থই দান করিতে হইবে—ইহাই শাশ্বত নিয়ম।

স্মরণ রাখিবে—জীবন মরণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামে রত থাকার ন্যায় মহান্ ধর্ম্ম এজগতে আর কিছুই নাই।

বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণের উদ্দেশে আমি বলিতে চাই—অন্যায় অবিচার ও স্বৈরাচারের পথে উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে ক্ষান্ত

হও। এখনও প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় আছে। যে অস্ত্র ফিরিয়া আসিয়া তোমারই বক্ষে বিদ্ধ হইবে, তাহা কদাচ নিক্ষেপ করিও না।

আমার দ্বিতীয় এবং শেষ অনুরোধ এই যে আমার শান্তিময় মৃত্যুর প্রতিবন্ধক হইয়া পাশবিকবল প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইওনা। Terence Macswiney, যতিন দাস, মহাত্মা গান্ধী এবং ১৯২৬ সালে আমি যখন অনশন আরম্ভ করি, গভর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে তাঁহারা এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমি আশা করি বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাঁহারা ঐ নীতিই অবলম্বন করিবেন। অপর পক্ষে পাশবিক বলে আমার অনশন ব্রত ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলে, আমি যথাসাধ্য বাধাপ্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইবনা, এবং তাহার পরিণাম হয়ত ভয়ঙ্কর শোচনীয় হইতে পারে। আমি ১৯৪০ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে অনশন আরম্ভ করিব।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভালরূপই জানিতেন যে এই পত্র কোন দুর্ব্বলচেতা রাজনীতিবিদের পত্র নহে, পরন্তু ইহা একজন দৃঢ়চেতা সংগ্রামশীল স্বদেশ-প্রেমিকের পত্র—যিনি নিজের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করিবার জন্য যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট কিয়ৎকালের জন্য এবিষয়ে উচ্চবাচ্য করিলেন না, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অনশন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা এই রাজবন্দীকে মুক্তিদানের আদেশ দিলেন। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে দুইটি অভিযোগ আনীত

হইয়াছিল, তিনি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা স্থগিত রহিল। মুক্তিলাভের পর সুভাষচন্দ্র তাঁহার এলগিন রোডের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান

সুভাষচন্দ্র তাঁহার এলগিন রোডের বাসভবন হইতে কিরূপে অন্তর্ধান হইয়াছিলেন তাহা এখনও গভীর রহস্য জালে আবৃত। আকালী দলের বিশিষ্ট নেতা মাষ্টার তারাসিং তাঁহার মাসিক পত্র "সন্ত সিপাহী"তে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৯ সালে একবার অন্তর্ধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে অসুস্থতার জন্য মুক্তিলাভের পর নেতাজী কলিকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক সর্দ্দার নিরঞ্জন সিং তালিবের নিকট রূশিয়ায় গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তালিব পাঞ্জাব কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং আকালীদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে কম্যুনিষ্টগণ শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে রূশিয়ায় প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান হন।

শ্রীযুত বসু কলিকাতা ত্যাগ করিবার ২৬ দিন পরে তাঁহার অন্তর্ধানের কাহিনী প্রচার করা হয়। তিনি ১৯৪০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মোটরে কলিকাতা ত্যাগ করেন, এবং বর্দ্ধমানে পাঞ্জাব

মেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি কামরায় আরোহণ করেন।* ঐ কামরা তাঁহার জন্য রিজার্ভ করা ছিল। ঐ সময়ে তাঁহার বড় বড় চুল ও শ্মশ্রু হইয়াছিল। পেশোয়ারে পৌঁছিবার পর তাঁহাকে পাঠানের ন্যায় দেখায়। তিনি ছয়দিন খান আব্বাজ খানের নিকট ছিলেন। পেশোয়ার হইতে একজন দেহরক্ষী সহ তাঁহাকে কাবুলে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। নেতাজী পেশোয়ার হইতে একখানি পেশোয়ারি টোঙ্গায় পাঁচ মাইল পথ গমন করেন। তাহার পর তিনি পদব্রজে যাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি তৎকালে জিয়াউদ্দিন নামক ছদ্মনাম ধারণ করিয়াছিলেন!

কাবুলে উপনীত হইয়া নেতাজী আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। ঐ অবস্থায় তিনি একজন গোয়েন্দার হাতে পড়েন।

* ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি সুভাষ বাবুর অন্তর্ধানের সংবাদ প্রচারিত হয় এবং বৎসরাধিক কাল এই পলায়ন-কাহিনী রহস্যজালে আবৃত থাকে। প্রথমতঃ অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, তিনি রাজনৈতিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় সন্ন্যাস-জীবন আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নির্য্যাতন হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য বৈদেশিক রাজ্যে গিয়া আত্মগোপন করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেন্টের Home Department এর সেক্রেটারি যখন বিবৃতি দেন যে সুভাষবাবু ইটালির রাজধানী রোম নগরীতে অথবা জার্ম্মাণ রাজধানী বার্লিনে অবস্থান করিতেছেন, তখন তাঁহার দেশবাসিগণ এ সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে যখন আংলো ইণ্ডিয়ানদিগের মুখপত্র Statesman এ উপর্য্যুপরি কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং

কিন্তু তিনি একখানি দশটাকার নোট ও একটি ফাউণ্টেন পেন দিয়া তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তথা হইতে তিনি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানান যে তাঁহারা এখন তাঁহাকে (শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে) আশ্রয় দিতে পারেন না। কারণ রুষ-জার্ম্মাণ মৈত্রী-চুক্তি ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আলাপ আলোচনা চলিতেছে। সেইজন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ব্রিটিশকে আর বিরক্ত করিতে চাহেন না। ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে একজন জার্ম্মাণ কাবুলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি জানিতে পারেন যে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ভারত ত্যাগ করিতে চাহেন। তিনি

উহাতে বর্ণিত হয় যে সুভাষবাবু কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার কালিন চক্রশক্তির নির্দ্দেশক্রমে 'পঞ্চম বাহিনী' সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন এবং বর্ত্তমানে চক্রশক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া রোম অথবা বার্লিনে অবস্থান করিতেছেন তখনও অনেকে সংবাদটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতঃস্তত করিতেছিলেন। তাহার অল্পদিন পরেই প্রচারিত হয়, তিনি বিমানযোগে টোকিও গমন কালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পরিশেষে Bombay Cronicleএ লণ্ডনের সংবাদ-দাতার পত্রে ইহার প্রতিবাদপাঠে অবগত হওয়া যায় যে সুভাষবাবুর মৃত্যু হয় নাই, পরন্তু তিনি অক্ষত শরীরে বার্লিনে অবস্থান করিতেছেন, এবং জার্ম্মাণ অধিনায়ক তাঁহাকে India's Fucherer and Excellency উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। পরিশেষে এই সংবাদ নানাদিক হইতে সমর্থিত হয়। "Rebel President"

তৎক্ষণাৎ বার্লিনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাহার পর রুশিয়ার উপর দিয়া বিমানে তাঁহাকে বার্লিনে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হয়।

লাহোরের Daily Milap পত্রে লালা উত্তমচাঁদ নামক একজন রেডিও ব্যবসায়ী নেতাজীর সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে নেতাজী কাবুলে গিয়া প্রথমে এক লরিচালকের হোটেলে অবস্থান করেন। তিনি পাঠানের বেশে সজ্জিত ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার শ্মশ্রু দীর্ঘ হইয়াছিল এবং পাঠানদিগের ন্যায় মস্তকে ফেজও পরিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন পেশোয়ার বাসী দোভাষী ছিল। এই সময়ে আফগান ডিটেক্টিভ বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারি সন্দেহক্রমে সুভাষ বাবুকে নানাবিধ প্রশ্ন করেন। দোভাষী পুলিশ-কর্ম্মচারিকে বুঝাইয়া দেন যে ইনি একজন পেশোয়ারি ভদ্রলোক, কিন্তু 'কালা ও বোবা।' গোয়েন্দা পুলিশ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হওয়াতে নেতাজী তাঁহার রিষ্টওয়াচটি প্রদান করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধারলাভ করেন।

অতঃপর নেতাজী লালা উত্তমচাঁদের বিষয় অবগত হন, এবং তাঁহার আবাসে গিয়া কয়েকদিন অবস্থান করেন। তাহার পর তিনি বিমানযোগে বার্লিন যাত্রা করেন।

নেতাজীকে আশ্রয় দেওয়াতে লালা উত্তমচাঁদ পুলিশ কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহাকে কাবুল হইতে পেশোয়ারে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। একরাত্রি গৃহবাস

করিবার পরই সি, আই, ডি বিভাগ হইতে পুনরায় তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং সীমান্ত প্রদেশ, লাহোর এবং পাঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন জেলে চারি বৎসর আটক রাখিবার পর সম্প্রতি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অল্পদিন হইল ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি মিঃ এইচ, জি, ওয়েটম্যান নয়া দিল্লীর কেন্দ্রীয় পরিষদে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে ১৯৪২ সালের মে মাস হইতে জুন মাসের মধ্যে লালা উত্তমচাঁদকে গ্রেপ্তার ও আফগানিস্থান হইতে বহিষ্কার করা হয়। পরে তাঁহার সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁহার নামে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইয়াছে।

এদিকে সুভাষ বাবু তাঁহার এলগিন রোডের বাটী হইতে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায়, কলিকাতা পুলিসকোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে যে মোকর্দ্দমা চলিতেছিল, দিনের পর দিন তাহা মুলতুবী রাখা হইতেছিল। তাঁহাকে আদালতে হাজির করান অসম্ভব হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহার এলগিন রোডের বাড়ীর অংশ ক্রোক দিলেন। ক্রোকের পর ছয় মাসের মধ্যেও তিনি আদালতে উপস্থিত না হওয়ায়. ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে উহা নীলাম হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে কোনও খরিদার উপস্থিত না হওয়ায়, পুনরায় অপর একটি দিন ধার্য্য করা হয়। দ্বিতীয় দিনেও কোন খরিদার উপস্থিত না হওয়াতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নীলাম স্থগিত রাখিবার ব্যবস্থা হয়।

সামরিক শিক্ষা

(আজাদ হিন্দ ফৌজের অঙ্কুর)

সুভাষচন্দ্র কাবুল হইতে বিমানযোগে বার্লিনে উপস্থিত হইয়া জার্ম্মাণ রাষ্ট্রাধিপতি হের হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত গোপন পরামর্শ হইবার পরে লিবিয়া এবং ফ্রান্সে যে ১২০০০ বন্দী ভারতীয় সৈন্য ছিল তাহাদিগকে লইয়া জার্ম্মাণিতেই তিনি প্রথম 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেন। মহামতি হিটলার ড্রেসডেনে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই সৈন্য বাহিনীর সহিত অল্পসংখ্যক জার্ম্মাণ পদাতিক সৈন্য ছিল। ঐ দিন হিটলার সুভাষ বাবুকে His Excellency Fucherer of India সম্মানে ভূষিত করেন। সুভাষবাবু এই স্থানে থাকিয়াই সামরিক শিক্ষালাভ করেন।

হিটলারের বক্তৃতা

নবগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ দৃষ্টে হিটলার যে বক্তৃতা করেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রিয় জার্ম্মাণ সৈনিকগণ এবং স্বাধীন ভারতীয় সৈনিকগণ!

Free India State বা স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী অধিনায়ক মহামান্য হের সুভাষচন্দ্র বসুকে (Herr Subhas Chandra

Bose—His Excellency the Provisional Head of the Free India State) আজ আমি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। যে সকল স্বাধীন ভারতবাসী তাঁহাদের দেশমাতৃকাকে ভালবাসেন, এবং তাঁহাকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে চান, তাঁহাদিগকে প্রকৃতপথে চালিত করিবার জন্যই সুভাষবাবু এখানে আসিয়াছেন। এই সৈন্যগণ যখন বর্ত্তমানে স্বাধীন দেশের অন্তর্ভুক্ত, তখন তাহাদিগকে উপদেশ বা পরামর্শ দিতে যাওয়া আমার পক্ষে অসঙ্গত হইবে। আজ হইতে তাঁহারা তাঁহাদের এই শ্রদ্ধেয় এবং সম্ভ্রান্ত অধিনায়কের আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিবেন সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণ সৈনিক এবং নাগরিকগণকেও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তোমাদের অধিনায়ক যেমন এখানকার ৮ কোটী লোকের স্বার্থ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেইরূপ হের বসুও ভারতের ৪০ কোটী লোকের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি যেরূপ সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাক, আজ হইতে তাঁহার প্রতিও সেইরূপ সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে।

ফিল্ডমার্শাল রোমেল একবার আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবিরে গিয়া এই নূতন ভারতীয় বাহিনীকে দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন —এই বাহিনীর খাদ্য, পোষাক, ভাষা এবং আকৃতিগত এমন কোন পার্থক্য দেখা যায় নাই, যাহাদ্বারা ইহাদিগকে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া পৃথক করিতে পারা যায়।

Indian Independence League

বা

ভারতীয় স্বাধীন প্রতিষ্ঠান

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু অনেক পূর্ব্বেই জাপানে গিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। জাপানে অবস্থানকালে স্বদেশানুরাগী একদল প্রবাসী ভারতীয় লইয়া তিনি Indian Independence League বা ভারতীয় স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নামে এক সমিতি গঠন করেন। ঐ সমিতির প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র প্রথমে ব্যাঙ্ককে ছিল। তৎপরে ১৯৪৩ সালে ইহা সোনানে স্থানান্তরিত হয়। ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দুচীন, যাবা সুমাত্রা ফিলিপাইন, সাংহাই, হংকং এবং জাপানে এই সমিতির শাখা ছিল। ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৭॥ লক্ষ।

১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপান ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তৎপরে জাপান তড়িতগতিতে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর অধিকার করে। ইহার পরেই জাপান সেনাপতি টোজো (General Hideki Tozo) প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেন ভারতের স্বাধীন সংগ্রামে জাপান গভর্ণমেণ্ট Independence Leagueকে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন।

জেনারেল Tozoর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান প্রধান ভারতীয় নেতৃগণকে লইয়া টোকিওতে একটি সভার অধিবেশন হয়। তৎপরে রাসবিহারী বাবু ব্যাঙ্ককে আসিলে পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতিনিধিগণকে লইয়া তাঁহার নেতৃত্বে ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত কয়েকটি বৃহত্তর সভার অধিবেশন হয়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভই এই সভাগুলির উদ্দেশ্য ছিল। রাসবেহারী বাবু বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও নবোদ্যমে একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করিবার চেষ্টা করেন, এবং তদুপলক্ষে অর্থসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। যাঁহারা সেনাদলে যোগ দিলেন, তাঁহাদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইল।

সুভাষচন্দ্রের আগমন

১৯৪৩ সালের ১৫ই জুন তারিখে সুভাষবাবু বার্লিন হইতে একখানি জার্ম্মাণ সাবমেরিণের সাহায্যে প্রথমতঃ সুমাত্রা দ্বীপে উপস্থিত হন। তথা হইতে বিমানযোগে টোকিও নগরে আগমন করেন। তাঁহার আগমন সংবাদে নবগঠিত সৈন্যগণের মধ্যে এক উত্তেজনার সঞ্চার হয়। সুভাষবাবু ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। রাসবেহারী বাবু ৪ঠা তারিখে একটি বিরাট সভার আয়োজন করিয়া সুভাষবাবুকে Leagueএর সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন। এই গুরুদায়িত্বভার সুভাষ

বাবু আনন্দ সহকারে গ্রহণ করেন। রাসবেহারী বাবু League এর সর্ব্বোচ্চ পরামর্শদাতা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

পূর্ব্ব এশিয়ায় যে সময়ে শ্রীযুক্ত রাসবেহারী বসু ও শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অদম্য উৎসাহে স্বাধীন সংগ্রামের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। কংগ্রেস নেতৃগণ একে একে কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন। ভারতীয়গণ দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ব্রিটিশ বিমান-বহরের বোমা বর্ষণে শত শত গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত হইতে লাগিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

এই সংবাদ তড়িদ্বেগে পূর্ব্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং সদ্যগঠিত সেনা বাহিনীর মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অনতিবিলম্বে ক্যাপ্টেন মোহনসিংএর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন কার্য্য আরম্ভ হইল। মালয়ে যে সকল ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহাদের লইয়াই প্রথম সেনাবাহিনী গঠিত হইল।

৪ঠা জুলাই তারিখের সভায় সুভাষবাবু যে বক্তৃতা দেন তাহাতে জানা যায় যে এই জাতীয় বাহিনীকে চালিত করিবার

জন্য তিনি অচিরে Provisional Govt of Free India নামে একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। সুযোগ হইলে সেই সেনাবাহিনী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কর্ম্মবীর সুভাষচন্দ্র সেই স্মরণীয় দিবস (১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই) হইতে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই।

পূর্ব্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়গণ নবীন উৎসাহের সহিত এই নবাগত বাঙ্গালীবীরকে তাহাদের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিল, এবং অত্যন্ত আবেগভরে তাঁহাকে "নেতাজী" এই আখ্যা প্রদান করিল। ৭ই জুলাই তারিখে সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল আফিসের সম্মুখস্থ ময়দানে নেতাজী এই জাতীয় বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখিলেন এবং তাহাদের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। "দিল্লী চল" এই শ্লোগানটিও সৈন্যগণকে শিক্ষা দেওয়া হইল।

৮ই জুলাই তারিখে নেতাজী জলদগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিলেন ভারতের জাতীয়বাহিনীর গঠন কার্য্য শেষ হইয়াছে। সমগ্র জগৎ এ সংবাদে বিস্মিত হইল।

৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরের ময়দানে ৫০০০০ সৈন্য সমাবেশ করিয়া নেতাজী ঘোষণা করিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সমস্ত স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সৈন্য অর্থ অথবা আবশ্যকীয় সমারোপকরণ সংগ্রহ করা হইবে।

সিঙ্গাপুরের অভিভাষণ

কেন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!

যে তীব্র উৎসাহের সহিত অভিনন্দন জানাইয়া আপনারা আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন তাহার জন্য আজ সর্ব্বপ্রথম আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার যে বিপুল সংখ্যক ভগ্নী তাঁহাদের দেশাত্মবোধকে বাস্তবরূপ দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিচার করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, হোনান ও মালয়ে আগামী সংগ্রামে আমার দেশবাসীরাই জয়ী হইবে। একদিন যেস্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পীঠস্থল ছিল, আজ সেই স্থানই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্র-স্থলে পরিণত হইয়াছে।

অতঃপর দেশত্যাগ করিয়া কেন আমি এই বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করিলাম তাহা আপনাদের সম্মুখে পরিষ্কাররূপে বলিতে চাই।

আপনারা জানেন ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ পার হইয়া উহার পরবর্ত্তী সকল স্বাধীনতা আন্দোলনেই আমি সক্রিয়-ভাবে যোগদান করিয়াছি। গত কুড়ি বৎসরের সকল আইন-অমান্য আন্দোলনের সহিত আমার দৃঢ়সংযোগ ছিল। ইহা ব্যতীত, অহিংস অথবা সহিংস সকলপ্রকার গোপন বৈপ্লবিক

আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত থাকার সন্দেহক্রমে বহুবার আমাকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া বলিতে পারি যে, আমি যেরূপ বহুমুখী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছি, ভারতে অন্য কোন জাতীয়তাবাদী নেতা সেরূপ অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন না।

এই অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতবর্ষের মধ্য হইতে আমরা যত তীব্র আন্দোলনই করিনা কেন, তাহা আমাদের দেশকে বৃটিশ প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবেনা। যদি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যকার সংগ্রামই স্বাধীনতালাভের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই নির্ব্বোধের ন্যায় বিনা প্রয়োজনে এই বিপদের ঝুঁকি লইতাম না।

আমার ভারত ত্যাগ করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের মধ্যে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছে বাহির হইতে তাহাকে সাহায্য করা। প্রকৃতপক্ষে বহিঃসাহায্য ব্যতীত কাহারও পক্ষেই ভারতকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বহিঃসাহায্য অবিলম্বে প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে একান্ত অল্প। ইহার কারণ এই যে চক্র-শক্তির আঘাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় আসন টলায়মান হইয়া পড়িয়াছে। ফলে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

আমাদের দেশবাসীর যে সাহায্য প্রয়োজন তাহার দুইটি

দিক আছে নৈতিক ও কায়িক। প্রথমতঃ—তাহাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, একদিন তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করিবেই। দ্বিতীয়তঃ ভারতের বাহির হইতে তাহাদের সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলকি তাহা বিচার করিতে হইবে। দ্বিতীয় আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে প্রবাসী ভারতীয়গণ মাতৃভূমিকে কি সাহায্য করিতে পারে এবং যদি প্রয়োজন হয় দেখিতে হইবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভ করা সম্ভব কিনা। বন্ধুগণ! আমি এখন বলিতে পারি, আমাদের এই দুইটি উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়াছে। সুদূরবর্ত্তী মহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আমি আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং বিভিন্ন সমররত শক্তিগুলির অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। ইহার দ্বারা আমি যখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম যে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় নিশ্চিত, তখন আমি সে সংবাদ আমার মাতৃভূমিতে প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর আমি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতীয়গণের মধ্যে একতীব্র জাগরণের সাড়া আসিয়াছে এবং তাহারা জাতীয় সংগ্রামের অংশ গ্রহণ করিতে বিশেষ ব্যগ্র। আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াও উৎসাহিত হইলাম যে, চক্রশক্তি সত্যই ভারতকে স্বাধীন দেখিবার জন্য ব্যগ্র এবং ভারতীয়গণ আগ্রহ প্রকাশ করিলেই তাহারা

তাহাদের শক্তি অনুযায়ী ভারতকে যে কোন সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত। প্রবাসী ভারতীয়দের মনোভাব সম্পর্কে আমি বলিতে পারি যে, তাহাদের মধ্যে এরূপ এক ব্যক্তিও নাই যে ভারতের স্বাধীনতা চায় না এবং জাতীয় সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত নহে।

আপনাদের নিকট আমার দাবী এই যে, আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন। আমার শত্রুও একথা বলিতে সাহসী হইবে না যে আমি এরূপ কোন কার্য্য করিতে পারি—যাহা আমার দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাকে ধ্বংশ করিতে না পারে, পৃথিবীতে আর কোন শক্তিই তাহা পারিবে না। আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন—যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনারা বহিঃশক্তির সাহায্য চান, আমি বলিতেছি, চক্রশক্তি আপনাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিবে। কিন্তু আপনারা সাহায্য চান কিম্বা চাননা, তাহা আপনারাই বিচার করিবেন এবং ইহা বলাই বাহুল্য যে যদি বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীতই সাফল্যলাভ করিতে সক্ষম হওয়া সম্ভব হয়, ভারতের পক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিতে চাই যে, সর্ব্বশক্তিশালী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র, এমনকি পরাধীন ভারতের নিকটও সাহায্য ভিক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা জটিল পরিস্থিতির প্রয়োজনে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিলে কিছুই অপরাধ করা হইবে না।

শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে আজ সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পন্থা ঘোষণা করিবার দিন আসিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়গণ বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়গণ একটি সংগ্রামশীল বাহিনী গঠন করিতে যাইতেছে। এই বাহিনী ভারতস্থিত বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে। আমরা যখন আক্রমণ করিব, তখন ভারতের অভ্যন্তরেও বিপ্লব সুরু হইবে। এই আন্দোলন কেবলমাত্র বেসামরিক জনসাধারণই করিবে না, বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত সৈনিকগণও বিদ্রোহ করিবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন অভ্যন্তর ও বহির্দ্দেশ উভয়দিক হইতে আক্রান্ত হইবে, তখন ইহা অচল হইয়া পড়িবে এবং ভারতীয় জনগণ সেই সময়ে পুনরায় তাহাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে।

সুতরাং আমার কল্পনা অনুসারে চক্রশক্তি ভারত সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব পোষণ করে--সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। যদি কেবলমাত্র বিদেশস্থিত ও স্বদেশস্থিত ভারতীয়গণ তাহাদের কর্ত্তব্য করিয়া যায়, আমি বলিতেছি, তাহা হইলে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান নিশ্চয়ই ঘটিবে।

সুবিধাবাদীরা মন্তব্য করিতে পারে যে, যদি ৩৮ লক্ষ ভারতবাসী বৃটিশ শক্তিকে বহিস্কৃত করিতে না পারে, তাহা হইলে কেবলমাত্র ২০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়ের দ্বারা ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? বন্ধুগণ, আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাসের প্রতি আমি

আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বৃটিশের অধীনস্থ ৩০ লক্ষ আয়ারবাসী সামরিক আইনের আওতায় থাকিয়াও কেবলমাত্র পাঁচ হাজার সশস্ত্র সিন্‌ফিন্ স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য পাইয়া ১৯২১ সালে বৃটিশ প্রভুত্বের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আজ ৩০ লক্ষ ভারতীয় মাতৃভূমিতে এক শক্তিশালী বিপ্লবের সাহায্য পাইয়া কেন বৃটিশ প্রভুত্বের কবল হইতে চিরতরে মুক্তিলাভের আশা করিতে পারে না ?

আমি চাই, প্রবাসী ভারতীয়গণ, বিশেষ করিয়া পূর্ব্বএশিয়াবাসী ভারতীয়গণ, এই কার্য্যে তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিবেন। আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিবার অভিপ্রায়ে আমি একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে চাই, এই গভর্ণমেণ্ট প্রবাসী ভারতীয়গণকে সংহত করিবে এবং ভারতস্থিত বৃটিশবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিবে। যখন আমরা এই সংগ্রামে জয়লাভ করিব ও ভারত স্বাধীন হইবে, তখন এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন ভারতের স্থায়ী গভর্ণমেণ্টের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে এবং সেই গভর্ণমেণ্ট ভারতের জনমতের দ্বারা গঠিত হইবে।

বন্ধুগণ আপনারা আজ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, ত্রিশলক্ষ প্রবাসী ভারতীয় যাহারা পূর্ব্ব এশিয়ায় বাস করিতেছে, তাহাদের পক্ষে আর্থিক ও জনশক্তি এবং অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে। এই বিষয়ে মনের সম্পূর্ণ সহযোগিতা কার্যোদ্ধার করিতে পারিবে না। আমি

সমগ্র ও সম্পূর্ণরূপে সংহত শক্তি চাই, ইহা অপেক্ষা কিছু কম নহে। কারণ আমরা বহুবার আমাদের শত্রুপক্ষের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, ইহা সামগ্রিক যুদ্ধ। আপনারা আজ আপনাদের সম্মুখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের এক অংশ—আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে দেখিতে পাইতেছেন। অন্য একদিন তাহারা তাহাদের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ টাউন হলের সম্মুখে করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা স্থির করিয়াছে যে, ভারতের প্রাচীন নগরী দিল্লীর লাল কেল্লার সম্মুখে কুচকাওয়াজ করিতে না পারা পর্য্যন্ত তাহারা সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। **'দিল্লী চল' 'দিল্লী চল'** ইহাই তাহারা শ্লোগান-রূপে গ্রহণ করিয়াছে। বন্ধুগণ পূর্ব্ব এশিয়ায় ত্রিশলক্ষ প্রবাসী ভারতীয়ের এই চরম যুদ্ধের জন্য চরম সংহতির শ্লোগান হউক **'দিল্লী চল'**। আমি এই চরম সংহতির মধ্য হইতে কমপক্ষে তিন লক্ষ সৈন্য এবং নয় কোটী টাকা পাইতে আশা করি। আমি এতদ্ব্যতীত 'মৃত্যু ভয় হীন বাহিনীর' জন্য একদল সাহসী মহিলা চাই। একদা ১৮৭৫ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁন্সীর রাণী যে বীরত্বের সহিত তরবারি চালনা করিয়াছিলেন, এই নারী-বাহিনীকেও সেইরূপ বীরত্বের পরিচয় দিতে হইবে।

বন্ধুগণ আমরা বহুদিন যাবৎ ইউরোপের দ্বিতীয় ফ্রণ্টের কথা শুনিতেছি, কিন্তু আমাদের স্বদেশবাসী বর্ত্তমান সময়ে চুড়ান্তভাবে নির্য্যাতিত হইতেছে, তাহারা এখন দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবী করে। আমাকে পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত সংহত শক্তি দান করুন, আমি

দ্বিতীয় ফ্রন্টের প্রতিজ্ঞা করিতেছি – বাস্তবিক পক্ষে যাহা ভারতের সংগ্রামে দ্বিতীয় ফ্রন্ট। (নবযুগ—২৯ কার্ত্তিক, ১৩৫২ সাল)

সিঙ্গাপুর অভিভাষণের তিনদিন পরে অর্থাৎ ১২ই জুলাই তারিখে তিনি পুনরায় জানাইলেন সন ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই ঝাঁসীর রাণী নাম দিয়া পূর্ব্বএশিয়ায় এক নারীবাহিনী গঠন করিতে হইবে। ইহার পর আগষ্ট মাসে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান অধিনায়ক হইলেন।

এই ঘটনার পরে নেতাজীর প্রতিভা, অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অনতিবিলম্বে লক্ষ লক্ষ সৈন্য আসিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিতে লাগিল এবং আজাদ হিন্দ ধনভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য সমরোপকরণ আসিতে আরম্ভ করিল। স্বেচ্ছাসেবকগণকে সামরিক শিক্ষা দিয়া উচ্চপদের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি শিক্ষা শিবিরও সংস্থাপিত হইল, এবং এই বিরাট বাহিনী ভবিষ্যৎ স্বাধীন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট

অতঃপর স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি হইল। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে Independence

League এর প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় নেতাজী অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সংগঠন সংবাদ ঘোষণা করিলেন। সেই ঘোষণাপত্রে তাঁহার নিজের ও নবগঠিত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীগণের নাম সাক্ষরিত ছিল। এই অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের বিশেষত্ব এই ছিল যে ভারতের জাতীয় বাহিনীর অন্তর্গত মিসেস্ লক্ষ্মী নামে এক নারীকে মন্ত্রীসভার অন্তর্ভূক্ত করিয়া লওয়া হইল। পরদিন রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে নেতাজী "ঝাঁসীর রাণী সেনাবাহিনী"—(Rani of Jhansi Regiment) নাম দিয়া এক নারীবাহিনী গঠন করিলেন। বিংশ বৎসরের নিম্ন সহস্র সহস্র বালিকা নবীন উৎসাহের সহিত এই নারী বাহিনীতে যোগদান করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হইতে লাগিল।

এই গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার অব্যবহিত পরেই জার্ম্মাণি, জাপান প্রভৃতি সাতটি স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট আনন্দ সহকারে এই গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন করিলেন।

জাপানের সহিত চুক্তি

জাপান গভর্ণমেণ্টের সহিত আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ মিত্র শক্তিগণের ন্যায় ছিল। জাপানের পররাষ্ট্রসচিব Mr. Renzu Sawada সামরিক বিচারালয়ে Captain

শাহ-নওয়াজ প্রভৃতি সৈনিকগণের বিচারকালে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে ভারত অভিযানের পূর্ব্বে জাপান গভর্ণমেণ্টের সহিত আজাদ গভর্ণমেণ্টের এক চুক্তি পত্র সাক্ষরিত হইয়াছিল এবং উভয়পক্ষই দুইটি পৃথক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছিলেন। জাপান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ঘোষণা পত্রে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহারা ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, এবং সেই যুদ্ধে যে কোনও দেশ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইবে অথবা লুণ্ঠন করিয়া যাহা কিছু হস্তগত হইবে তাহা আজাদ গভর্ণমেণ্টকেই দিতে হইবে। জাপানের জেনারেল এই পত্রে সাক্ষর করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সুভাষবাবু একটি ঘোষণাপত্রে জানাইয়াছিলেন যে তাঁহারা জাপানের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন, কিন্তু জাপান ভারতের কোনও অংশ জয় করিতে পারিলে তাহা আজাদ গভর্ণমেণ্টকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই ঘোষণাপত্র সুভাষবাবুর সাক্ষরিত ছিল।

ঝাঁসীর রাণী সেনা বাহিনী

(Rani of Jhansi Regiment)

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ১৮৫৭ সালে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই নারীবাহিনীর নাম দেওয়া হইয়াছিল— 'ঝাঁসীর রাণী সেনা বাহিনী'। ১৯৪২ সালের ২২শে অক্টোবর

ঝাঁসীর রাণীর জন্মদিবস উপলক্ষে সিঙ্গাপুরে এই বাহিনীর গঠন মূলক কার্য্য আরম্ভ হয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া ও জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়া এই বাহিনীর উদ্বোধন করা হয়। সকল ধর্ম্মের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন স্বেচ্ছাসেবিকা আসিয়া এই বাহিনীতে যোগদান করে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথম্ উক্ত বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। আজাদ গভর্ণমেণ্টের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা ও সাধারণ সেবা শুশ্রূষা করা ব্যতীত স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোকদিগকে যুদ্ধ বিভাগেও নিয়োগ করা হইত।

আজাদ হিন্দের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এই সেনাবাহিনী সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার শিক্ষা শিবির ও কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া এবং জাতীয় বাহিনীর পোষাকে সজ্জিত হইয়া এই নারীবাহিনী প্রত্যহ সকালে সমস্বরে প্রার্থনা করিত এবং নেতার প্রতি আস্থা রাখিয়া আমরণ দেশ সেবা করিবার সংকল্প গ্রহণ করিত। কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া এবং প্রত্যহ নূতন করিয়া স্বাধীনতার সংকল্পবাণী গ্রহণ করিয়া এই সৈন্যবাহিনী দৈনন্দিন কার্য্যে যোগদান করিত।

শিক্ষা

উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে নারীগণকে এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হইত। ইহাদিগকে অঙ্গচালনা, কুচকাওয়াজ,

অস্ত্রচালনা, নানাবিধ কৌশল, মানচিত্র গঠন ও সাধারণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। তিন মাস শিক্ষার পর যাহারা কষ্টসহিষ্ণু ও সকলপ্রকার বিপদ আপদ তুচ্ছ করিয়া দেশমাতৃকার সেবা করিতে উৎসুক, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই জাতীয় বাহিনীতে নিয়োগ করা হইত ও ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট ব্যজ দেওয়া হইত। রোমান হিন্দুস্থানির সাহায্যে সকলকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। বিশ্রামের সময় ব্যতীত সকলকেই সামরিক পোষাক পরিধান করিয়া থাকিতে হইত এবং সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা মানিয়া চলিতে হইত। পূর্ব্ব এশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সকল দেশেরই নারীগণ এই বাহিনীতে যোগদান করে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই একত্রে আহার বিহার করিত এবং একই ভাষায় কথা কহিত।

শিক্ষাকেন্দ্র

শিক্ষাকেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য অতি মনোরম ছিল। প্রথমতঃ দ্বাররক্ষিগণ উত্তম সামরিক পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বন্দুক ও তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান থাকিত। রক্ষিগণ ও তাহাদের অধিনায়কগণ সর্ব্বদাই তৎপর হইয়া আপনাপন কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত থাকিত। শান্ত্রীগণের কার্য্য ছিল অস্ত্রাগার রক্ষণ। তত্ত্বাবধায়কগণ মধ্যে মধ্যে শিক্ষাকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করিয়া রক্ষিদের ও অন্যান্য সকলের কার্য্যকলাপ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা লক্ষ্য করিতেন। প্রাতঃকালিন কুচকাওয়াজের

অব্যবহিত পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সকলেই আপনাপন আহার ও পানপাত্র লইয়া জলযোগের জন্য রন্ধনগৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দণ্ডায়মান থাকিত এবং আহার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পুনরায় কুচকাওয়াজের মাঠে উপস্থিত হইত ও আপনাপন অধ্যক্ষের আদেশের অপেক্ষায় থাকিত। ইহার পরই সর্ব্বপ্রকার সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাহারা প্রত্যহ বেলা ১টার সময়ে স্নান আহার করিত। অপরাহ্নে বক্তৃতাদ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইত। রোমান হিন্দুস্থানী শিক্ষা দেওয়াই এই ক্লাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সপ্তাহে দুইদিন কুচকাওয়াজ করিয়া ভ্রমণের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তাহারা যখন পৃষ্ঠে থলি, স্কন্ধদেশে বন্দুক, পায়ে বুট ও পট্টি পরিয়া এবং দলের অধিনায়িকাকে সম্মুখে লইয়া কুচকাওয়াজের গান (Marching song) গাহিতে গাহিতে তালে তালে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইত, সে দৃশ্য দেখিতে বড়ই মনোরম বোধ হইত। এইরূপ একটি দল একবার মেমিও হইতে মান্দালাই পর্য্যন্ত প্রায় ৪৪ মাইল পথ কুচকাওয়াজ করিয়া যায়। ক্লান্তি বোধ হইলে তাহারা গান গাহিয়া, গল্প করিয়া ও যুদ্ধেরত ভ্রাতৃগণের কথা স্মরণ করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিত।

নারীবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য

এই সেনাবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য এই যে তাহারা যেন স্বাধীন ভারতে পুরুষের সঙ্গে থাকিয়া সমানভাবে সকলপ্রকার

দায়িত্ব গ্রহণ করে। কেবল গৃহকর্ম্মে লিপ্ত থাকাই স্ত্রীলোকের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু পুরুষগণের সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন করাও তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু স্বাধীনতার সুখ পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই ভোগ করিবে। সুতরাং এই সংগ্রামে যোগদান করিতে হইলে শারীরিক যোগ্যতা ও কঠোর শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশ অশিক্ষিতের দেশ—স্ত্রীলোকগণ আপনাপন শুভাশুভ বুঝিতে পারেন না। একবার যদি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবেন না। ভারতে এমন দিনও ছিল যখন মাতা ও ভগিনীগণ তাঁহাদের পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া হাসিমুখে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিতেন। যে শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া মাতৃজাতি পুরুষ জাতিকে এইরূপ উৎসাহিত করিতেন, সে শক্তি বর্ত্তমানে সুপ্ত অবস্থায় আছে। তাহাকে জাগ্রত করাই এই নারীবাহিনীর উদ্দেশ্য। কারণ 'বীরমাতাই কেবল বীরসন্তান প্রসব করিতে পারে।' ঝাঁসীর রাণী এইরূপ একজন আদর্শ বীর রমণী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার নামানুসারে এই বাহিনীর নামকরণ হইয়াছিল। নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত নারীবাহিনীর অধিনায়িকা ডাক্তার লক্ষ্মীবাইও ঝাঁসীর রাণীর ন্যায় তেজস্বিনী রমণী। ইঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই নারীবাহিনীর প্রত্যেক রমণীর চিত্ত জয় করিয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

কিরূপ মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শত সহস্র নারী আপন আপন গৃহ পিতামাতা পুত্রসন্তান এবং সুখ সম্ভোগ বিসজ্জন দিয়া কঠোর জীবন যাপন করিতে পারে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ দ্বারা যে এই নারীগণকে এই কার্য্যে নিয়োগ করা হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাদের এই মহান্ স্বার্থত্যাগ যে বৃথা হইবে না এই মনোবৃত্তি লইয়াই তাহারা নারীবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। তাহারা কখনও মনে করে নাই যে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাহাদের মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

গোবিন্দরাও নামক জাতীয় বাহিনীর জনৈক সেনানী এই নারীবাহিনীর শৌর্য্য বীর্য্য সম্বন্ধে যে একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতে পারে।

মিত্র-সৈন্য ব্রহ্মদেশ জয় করিবার জন্য যখন অগণিত সৈন্য এবং অপর্য্যাপ্ত রণসম্ভার লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, সেই সময়ে মৌলমেনের নিকটে এই নারীবাহিনীর সহিত তাহাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যে সময়ে মিত্র শক্তি বড় বড় কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক প্রভৃতির সাহায্যে শত্রুসৈন্য ধ্বংশ করিতে উদ্যত, সেই সময়ে এই নারীবাহিনী কেবলমাত্র রাইফেল ও গুলির সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিল। পরিশেষে এই সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেও ইহাদের বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে।

আর এক কথা—ভারতীয়গণের অর্থ, ভারতবাসীর বুদ্ধি এবং

ভারতবাসীর রক্তদ্বারা এই নারীবাহিনী গঠিত হইয়াছিল। জাপানীদের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ ছিলনা। রেঙ্গুণ ব্রিটিশের হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই নারীবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

বালক সেনা

নেতাজীর জাতীয়-বাহিনী কেবল মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারী লইয়া সংগঠিত হয় নাই। পরন্তু ৯বৎসর হইতে ১৪বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাগণ এই স্বাধীন সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল। অতি অল্পকাল মধ্যে সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ায় এইরূপ দল সংগঠিত হইল এবং দলে দলে বালক বালিকাগণ আসিয়া বালক বাহিনীতে যোগ দান করিতে লাগিল। মানব মনের উপর সুভাষচন্দ্র কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার 'নারী-বাহিনী' ও 'বালক সেনা' সংগঠন কার্য্য হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনধিক তিন সপ্তাহের মধ্যে এই নবগঠিত বালক সেনা দলের যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইল। কোন কোন দল সঙ্গীন চালনা করিতেও শিক্ষা করিল। বালক সেনাগণের সতেজ মূর্ত্তি, সামরিক অভিবাদন দেখিয়া এবং জয় হিন্দ উচ্চারণ শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল এই কিশোর কিশোরীগণ কিরূপ উৎসাহ লইয়া এই স্বাধীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে।

নির্ভীকতা

এই বালক সেনা-বাহিনী যে কিরূপ সাহসী ছিল তাহা একটি ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ব্রিটিশ সেনা **মান্দালাইয়ে** প্রবেশ করিবার পর **'জয় হিন্দ'** অভিবাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল। বালক সেনাগণ এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া রাজ-পথে ব্রিটিশ সেনাগণকে দেখিবামাত্র 'জয়হিন্দ' শব্দে তাহাদিগকে অভিবাদন করিত।

এই বালক সেনা-বাহিনীর নির্ভীকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গোবিন্দরাও কিরডি (Attached to the 46 th. Mobile workshop Company) সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকটে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন—ভারতের জাতীয়-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বালক সেনা-বাহিনী ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তির ট্যাঙ্কগুলি ধ্বংশ করিবার জন্য Suicide Squad বা আত্মঘাতী সৈন্যরূপে কার্য্য করিয়াছিল। এই নির্ভীক সেনাদল মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ট্যাঙ্কের নিম্নে শয়ন করিয়া থাকিত এবং তাহাদের পশ্চাতে mine বসান থাকিত।

দৌত্য-বিভাগ

ভারতীয় জাতীয়-বাহিনীর 'বাহাদুর ব্রিগেডের' অন্তর্গত রাজারাম সিণ্ডি (Rajaram Shinde) নামে জনৈক উচ্চপদস্থ

কর্ম্মচারীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে নেতাজীর গঠিত বালক-সেনা বিভাগে ৫বৎসর হইতে ১৩বৎসর বয়সের কয়েক জন বালককে দৌত্য-কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহারা গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের (Indian Independence League এর) লিখিত পুস্তিকাগুলি গ্রামবাসিদের মধ্যে বিতরণ করিত। এই বালক-বাহিনী (Boy Battalions) রেঙ্গুণ, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিত।

মালয়ে বক্তৃতা

১৯৪৩ সালের ২৫ শে অক্টোবর নেতাজী মালয় প্রদেশে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং যাহার ফলে ধনী নির্ধন সকল ভারতবাসী তাঁহাদের ধনসম্পত্তি ভারতীয় সৈনিক বিভাগের তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বন্ধুগণ,

যখন একদল সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে, যুদ্ধ করিবার বা দেশ জয় করিবার দায়িত্ব সৈন্য বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইতে নিম্নপদস্থ সৈনিক পর্য্যন্ত সকলেরই উপর তুল্যাংশে অর্পিত হয়। ভারতভূমির যে সকল সন্তান অধুনা পূর্ব্ব এশিয়ায় অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে

হইবে। আপনাদের মধ্যে কেহ বা ধনী, কেহ বা নির্ধন, কেহ বা শিক্ষিত, কেহ বা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তথাপি আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে আপনাদের সকলকেই সমানভাবে অবহিত হইতে হইবে। আমি আশাকরি পূর্ব্ব এশিয়ার প্রবাসী প্রত্যেক ভারত-সন্তান প্রাণপণে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিবে।

আপনারা জানেন পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধে সোনান (Syonan) অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'ভারতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠান'এর (Indian Independence League) প্রধান কেন্দ্র এই সোনান। I. N. A বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। আজাদ হিন্দের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টও এই সোনানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সোনানে এক সময়ে ব্রিটিশ রাজ্যের দুর্গ ছিল, সেই সোনান এখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং সোনান হইতে যে আদেশ প্রচারিত হইবে তাহা সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়াকে মানিয়া লইতে হইবে।

আমরা এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কেবল সভাসমিতি করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিবেন যে কোন স্বাধীন দেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সভাসমিতি বা আবেদন নিবেদন করিবার প্রয়োজন আদৌ অনুভূত হয় না। স্বাধীন দেশের নেতৃগণ দেশের প্রত্যেক সবল ও সক্ষম ব্যক্তিকে যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করেন, এবং প্রত্যেক দেশবাসী স্বেচ্ছায় যুদ্ধ

ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীন দেশের অধিবাসীগণ অবগত আছেন যে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে বা (পরাধীন জাতির পক্ষে) স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, এবং সামরিক ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন হইলে, সভাসমিতি করিয়া বা আবেদন নিবেদন করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

বন্ধুগণ আরও দেখুন, দেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কাহারও কোন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি থাকিতে পারেনা, কিম্বা থাকা উচিত নহে। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়ে গভর্ণমেণ্ট বা রাজাকেই সমস্ত ধনসম্পত্তির মালিক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, কেননা স্বাধীনতা রক্ষা বা অর্জ্জন করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। দেশের লোকের সহানুভূতি ভিন্ন এই বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে না। আবার দেশ পরাধীন হইলে, অথবা রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলে ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তিরও অস্তিত্ব থাকে না। প্রত্যেক লোকের জীবনও তখন জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং আমাদের জীবন ও ধনসম্পত্তি এখন আর আমাদের নিজের নহে। উহাকে এখন সমগ্র ভারতেব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

বন্ধুগণ, আমরা ভারত মাতার নামে যে অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছি, সে গভর্ণমেণ্টের জন্য জনবল ও অর্থবল উভয়ই সংগ্রহ করিতে হইবে। বর্ত্তমান মহাসমরে জার্ম্মাণী ও জাপান শুধু যে দেশের সক্ষম ও বলিষ্ঠ প্রত্যেক

ব্যক্তিকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, প্রত্যেক লোকের ধন সম্পত্তি ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। আমরাও বর্ত্তমানে এই অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের পরিপুষ্টির জন্য জার্ম্মাণী ও জাপানের অনুকরণ করিব। স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট মাত্রেরই সে অধিকার আছে। যদি আপনারা মনে করেন আপনাদের পরিশ্রম লব্ধ ধনসম্পত্তি আপনাদের নিজের, তাহা হইলে আপনাদের ভুল হইবে। উহা এখন স্বাধীন ভারতের সম্পত্তি। আপনারা যদি স্বাধীনতার প্রার্থী না হন এবং স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ এই স্বার্থত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে আপনাদের জন্য একটি মাত্র পথ নির্দ্দিস্ট আছে-- যুদ্ধ শেষ হইবার পর যখন ভারত স্বাধীন হইবে, তখন স্বাধীন ভারতে আপনাদের স্থান হইবে না।

বন্ধুগণ, আমি সোনান হইতে আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছি, তাহাই আমার শেষ আবেদন। আজ আমি অর্থ সাহায্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হই নাই। আজ আমি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ এখানে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি যে আপনাদের জীবন এবং সম্পত্তির উপরে এই গভর্ণমেণ্টের অবাধ অধিকার আছে।

আজ আমি আপনাদিগকে কোন ফাঁকা কথা বলিতেছিনা— আমার সুচিন্তিত অভিমতই আমি চিরদিন সকলকে বলিয়া থাকি। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে **ভারতের**

স্বাধীনতা আমাকে যে কোনও উপায়ে অর্জ্জন করিতে হইবে। এ বিষয়ে আপনাদের সাহায্য স্বেচ্ছাকৃত হইলেই সুখের বিষয় হইবে। যদি না হয় আমাকে বাধ্যতামূলক আচরণ অবলম্বন করিতে হইবে। হয়ত বলপ্রয়োগ দ্বারাও অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। আপনাদের পক্ষে দুইটি পথ খোলা আছে। আপনারা হয় মিত্ররূপে যোগ দিতে পারেন, নতুবা শত্রুরূপে পরিগণিত হইতে পারেন। যাঁহারা এই স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়তা করিবেন, তাঁহারা আমাদের মিত্র, আর যাঁহারা বিপরীত পথে যাইবেন তাঁহারা আমাদের শত্রু মধ্যে গণ্য। আপনাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনারা একটা পথ বাছিয়া লইবেন। খোলাখুলি একথা বলিতেছি, কারণ আমরা এখন জীবন মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছি।

আপনারা আরও জানিয়া রাখুন ভারতীয় জাতীয়-বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আত্মপ্রাণ রক্ষার জন্য পশ্চাদপসরণ করিবে এরূপ শিক্ষা তাহাদের নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার, অথবা শেষ রক্তবিন্দু দান করিবার সংকল্প লইয়াই তাহারা এই যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

উপসংহারে আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে আমার দেশবাসীদের মধ্যে এরূপ উন্মাদনার সঞ্চার হইয়াছে যে তাঁহারা দলে দলে আসিয়া এই সেনা-বাহিনীতে যোগদান করিতেছেন। এখন আমাদের জনবল এত অধিক যে তাঁহাদের সাহায্যে আমরা দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম হইব। কিন্তু আমাদের

অর্থবল নাই। যদি আমরা সকলেই দরিদ্র হইতাম, তাহা হইলে বিদেশীর নিকটে অর্থভিক্ষা করা আমাদের পক্ষে অশোভন হইত না। কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে এমন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি অনেক রহিয়াছেন, যাঁহারা মনে করিলেই আমাদের অর্থাভাব দূর করিতে পারেন, তখন বিদেশীর দ্বারে ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত অপমানের বিষয় হইবে। আপনারা ভাবিয়া দেখুন, জীবন ও অর্থ এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। জীবনের সহিত তুলনা করিলে অর্থের স্থান কত নিম্নে। যদি কোন বিদেশী গভর্ণমেণ্ট আসিয়া বলে হে ধনিন্ তোমার আজন্ম সঞ্চিত কোটী স্বর্ণমুদ্রা অথবা তোমার জীবন এতদুভয়ের মধ্যে একটি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, তখন তুমি নিশ্চয়ই কোটী মুদ্রার বিনিময়ে আত্মপ্রাণ রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিবে।

ইটালিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া ও জার্ম্মানিতে যেভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইয়াছিল, ১৯৪২ সালে ইতালীতেও সেইভাবে আর একটি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। এই সকল সৈন্যের প্রাথমিক শিক্ষার পর স্থির হইয়াছিল যে তাহারা ভারতের সীমান্ত প্রদেশে ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য-বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু ইতালির সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত

আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তৃপক্ষের মতভেদ হওয়ায় এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

মিঃ ইক্‌বাল সেদাই ও মিঃ নিরঞ্জন সিংএর নেতৃত্বে ভারতীয় বন্দী সৈন্যগণকে লইয়া ইটালিতে অপর একটি দল গঠিত হয়। ইতালীয় অফিসারগণের দ্বারা তাহাদিগকে প্যারাসুট ব্যবহার করিতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে ইতালীয় সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই সৈন্যগণকে লইয়া লিবিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃগণ অসম্মত হন। ইহার ফলে এই সৈন্যদল পুনরায় যুদ্ধবন্দীরূপে গৃহীত হয়।

মাসিক বুলেটিন।

প্রতিমাসে Independence League এর বুলেটিন বাহির হইত। ১৯৪৩ সালের বুলেটিনে প্রকাশিত হইয়াছিল যে পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ এখন আর বৈদেশিক শক্তির অধীন নহে। তাহারা স্বাধীন আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রজা। অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের সদস্য হইতে হইলে সকলকেই শপথ গ্রহণ করিতে হইত। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসেব বুলেটিন দৃষ্টে জানা যায় যে তৎকালে ২৩২৫৬২ জন সদস্য শপথ গ্রহণ করিয়া League এর সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

সংবাদ পত্র

ক্যাপ্‌টেন সেগল বলিয়াছেন দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট

ইংরাজী, রোমান, উর্দ্দু ও তামিল ভাষায় যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 'দৈনিক আজাদ হিন্দ' (Daily Azad Hind) 'দিল্লী চলো' (On to Delhi) এবং 'ভারতের বাণী' (Voice of India) এই গুলিই প্রধান। এতদ্ভিন্ন এই গভর্ণমেণ্ট হইতে বহু পুস্তিকাও প্রকাশিত হইত। রেঙ্গুণ ও সিঙ্গাপুরে তাহাদের নিজের ছাপাখানা ছিল।

রেডিও ষ্টেশন

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের চারিটি Broadcasting Station ছিল। এই ষ্টেশনগুলির উপর বাহিরের কোনও শক্তির কোনও প্রভাব ছিলনা। মিষ্টার এস. এ. আয়ার (Publicity and Propaganda minister) এই রেডিও গুলির কার্য্য সম্বন্ধে সকল ব্যবস্থাই করিতেন। মিষ্টার তিলক নামে অপর একজন ভারতীয় রেঙ্গুণ রেডিও ষ্টেশনের ডিরেক্টর ছিলেন। ইঁহাকে কয়েকমাস কলিকাতায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার পর দিল্লীর লাল কেল্লায় লইয়া যাওয়া হয়। বিগত ১০ ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৬) তারিখে তিনি কারামুক্ত হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষে সাহায্য

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, তখন দেশগৌরব

সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর হইতে রেডিও যোগে জানাইয়াছিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্মত হইলে তিনি আজাদ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ দুর্ভিক্ষের প্রতিকার কল্পে এক লক্ষ টন চাউল এদেশে পাঠাইতে পারেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ

১৯৪৩ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে মালয় প্রদেশে বক্তৃতা দিবার পরে ১লা নভেম্বর তারিখে সুভাষচন্দ্র বিমান যোগে টোকিও গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রধান অধিনায়করূপে জাপান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। পরে ৭ই নভেম্বরের এক সভায় জেনারেল টোজো সুভাষবাবুকে জানাইলেন জাপান গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে নূতন অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইল। স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট পরে এই দুইটি দ্বীপের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'সহিদ' ও স্বরাজ' নাম দিয়াছিলেন।

১৯৪৩ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর নেতাজী স্বাধীন ভারতের প্রথম রাজ্য সহিদ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তথায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কর্ণেল লোকনাথন সহিদ ও স্বরাজ দ্বীপের প্রথম চিফকমিশনার নিযুক্ত হইলেন।

আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক।

১৯৪৪ সালের ৫ই এপ্রেল নেতাজী সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করেন। রেঙ্গুণ হইতে যাত্রা করিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে চারিজন স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির সাহায্যে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন। প্রথমতঃ এক কোটী টাকা মূলধন লইয়া এই ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হইল। পরিশেষে ইহার কার্য্যবৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে রেঙ্গুণের সহরতলীতে দুইটি এবং টঙ্গি (Taunggy) নামক স্থানে একটি মোট তিনটি শাখাও স্থাপিত হইল। হবিব সাহেব নামে ব্রহ্মের একজন স্বদেশপ্রেমিক এবং শ্রীমতী হীরাবাঈ বেতাই নামে একজন ধনাঢ্যা রমণী তাঁহাদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ এই স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করিবার জন্য নেতাজীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। হবিব সাহেবের ধনসম্পত্তি এক কোটী টাকার উপর ছিল। এই দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রহ্মদেশের অন্যান্য ভারতীয়গণ এই ব্যাঙ্কের ধনভাণ্ডারে কোটী কোটী টাকা দান করিয়াছিলেন। পরে নেতাজী এই সকল স্বার্থত্যাগী এবং স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণকে সেবক-ই-হিন্দ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

আজাদহিন্দ ব্যাঙ্ক রেঙ্গুণের ৯৪ নং পার্করোডে অবস্থিত ছিল।

ইহা ব্রহ্মদেশীয় আইনানুসারে রেজিষ্টারি করা হয়। এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে উক্ত প্রদেশে নেতাজী ভাণ্ডার (Nataji Fund) নামে একটি ধনভাণ্ডার খোলা হইয়াছিল। অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করাই এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল।

এই উপায়ে ব্রহ্মদেশে ১৫ কোটী এবং মালয়ে ৫ কোটী একুনে ২০ কোটী টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। আজাদ গভর্ণমেণ্টের টাকা ভিন্ন জন সাধারণের টাকাও এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হইত। ঐ টাকার পরিমাণ ৩০।৪০ লক্ষ হইবে। ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কের কাজ চলিয়াছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রেঙ্গুণ উদ্ধার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কাজ বন্দ হইয়া যায়। বন্দের সময়ে ব্যাঙ্কে ৩৫ লক্ষ টাকা জমা ছিল।

নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত আজাদ-হিন্দ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সুবিখ্যাত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে যে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ব্রহ্মদেশে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তহবিলে যাঁহারা অর্থদান করিয়াছেন, শ্রীযুক্তা হীরাবাঈ বেতাই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা দাতা। তিনি বহু লক্ষ টাকার সোণা রূপা হীরক প্রভৃতির গহনা ও নগদ ৫১০০০ টাকা উক্ত ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মদেশে রাণী ঝাঁসী বাহিনী গঠন করিবার জন্য বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ভারতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠানের

(Indian Independence League) মহিলা শাখার সভা-নেত্রীরূপে ভারতীয় মহিলাদের সংগঠন কার্য্যে তিনি নিজের সমস্ত সময় নিয়োগ করেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য প্রত্যেককে কিছু সাহায্য করিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯৪৪ সালের ২১ শে আগস্ট কামায়ুদে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস পালনার্থে ভারতীয়দের যে সভা হইয়াছিল, সেই সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীযুক্তা বেতাইয়ের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সেবক-ই-হিন্দ রৌপ্যপদক দ্বারা ভূষিত করেন। শ্রীযুক্ত বসু আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, জাতির কল্যাণ কার্য্যে নারীগণ পুরুষগণ অপেক্ষা পিছনে পড়িয়া নাই। নেতাজী আরও বলেন "শ্রীযুক্ত বেতাই শুধু যে তাঁহার নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন তাহা নহে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার স্বামী শ্রীযুত হেমরাজ বেতাইকেও বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিতে সম্মত করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় নারীদের অবদানের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।"

গুজরাটে শ্রীযুক্ত হেমরাজ বেতাইয়ের জন্ম হয়। তিনি ব্রহ্মদেশের আজাদ-হিন্দ ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টার ছিলেন। তিনি ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে যান। তখন পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার উদ্দেশ্যে নেতাজী বসু তাঁহাদিগকে একটি ফণ্ড গঠন করিতে বলেন। সেখানকার সকল সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ১৫ জন প্রতিনিধি লইয়া তখন একটি

কমিটি গঠন করা হয়। ঐ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত উক্ত কমিটির কার্য্য হয়। পরে নূতন কমিটি গঠিত হয়। শ্রীযুত বেতাই নূতন কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ফণ্ড খোলার পর ভারতীয়দের নিকট হইতে আশ্চর্য্য রকমের সাড়া পাওয়া যায়। ১৯৪৪ সালের ৫ই এপ্রেল যখন আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক খোলা হয়, তখন পূর্ব্ব এশিয়ার প্রত্যেক ভারতীয় উহাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। ব্যাঙ্ক স্থাপনের কয়েক মিনিটের মধ্যেই ৩০০টি একাউণ্ট খোলা হয়, এবং ডিপজিটের পরিমাণ হয় ২০ হইতে ২৫ লক্ষ টাকা। দুই মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কের দুইটি শাখা খোলা হয়। কিছুদিন পরে টঙ্গি নামক স্থানে আর একটি শাখাও খোলা হয়।

ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুত দীননাথ বলেন যে নেতাজী কর্ত্তৃক আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পর আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক স্থাপন একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। দুইটি উদ্দেশ্যে নেতাজী এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণরূপে জাপানীদিগের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়দের অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রকে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্যার্থে নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। জাপানীরা তাঁহার এই মনোভাব মোটেই পছন্দ করিতনা। তাহারা সর্ব্বদা চেষ্টা করিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয়েরা যেন তাহাদের অধীন হইয়া চলে। কিন্তু এবিষয়ে নেতাজী দৃঢ় মনোভাব পোষণ করিতেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করিতে পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা নেতাজীর প্রেরণায় কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার একটি দৃষ্ঠান্তের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত দীনমাথ বলেন যে রেঙ্গুনে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল সভাসমিতি তাঁহারা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, নেতাজীর ফুলের মালা এক লক্ষ টাকায় নীলামে বিক্রয় হইলে নেতাজীকে অপমানই করা হইবে। অবশেষে সেই ফুলের মালা ১২ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল।

স্বর্ণদ্বারা নেতাজীর ওজন।

আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে বিগত ১৯৪৫ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় বাহিনীর ৭জন সৈনিক জববলপুরের রাজ-কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুভাষ বাবুর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে এই ঘটনার উল্লেখ করেন। গত ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে সুভাষ বাবুকে স্বর্ণমানে ওজন করা হইয়াছিল। স্বর্ণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ পবিশেষে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের ধনভাণ্ডারে জমা দেওয়া হয়।

জিয়াওদি এস্টেট (Ziawadi Estate)

রেঙ্গুনের নিকটে 'জিয়াওদি' নামে একটি জমিদারী ছিল।

ইহার আয়তন ৫০ বর্গমাইল। এই জমিদারী অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। ইহার মধ্যে সুবৃহৎ চিনির কারখানা, পশমি সুত, কম্বল এবং চটের কারখানা ছিল। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট এখানে কয়েকটি হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানকার ১৫০০০ ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই এই সকল কারখানার কার্য্যে লিপ্ত ছিল। এই অনতিবৃহৎ সম্পত্তির আয় অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতেন এবং ইচ্ছামত ব্যয় করিতেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ অস্থায়ী স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভূক্ত হইবার অল্পদিন পরেই জাতীয় বাহিনী সিঙ্গাপুর ও মালয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম সীমান্তের অভিমুখে যাত্রা করে। অতঃপর আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রধান কেন্দ্র ব্রহ্মদেশে লইয়া যাওয়া হইল। ১৯৪৪ সালের ৪টা ফেব্রুয়ারি এই জাতীয় বাহিনী ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য আরাকান প্রদেশে প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র (গোলাগুলি) বর্ষণ করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈন্য বাহিনী এই দিন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য হইবে। এই যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়া মেজর মিশ্র উপরিতন সেনানায়কের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

নেতাজীর স্বদেশপ্রেম।

ভারত অভিযানের পূর্ব্বে নেতাজী তাঁহার জাতীয় বাহিনীর 'প্রিয় সেনানীগণকে' যে সঙ্গীত শুনাইয়াছিলেন তাহা যুগযুগান্তর ধরিয়া পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী নরনারীগণের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিবে।

"ঐ দূরে—অতিদূরে ঐ নদীর ওপারে ঐ পর্ব্বতমালার পরপারে, ঐ ঘন বনানীর অপরপারে—ঐ দেখা যায় আমাদের মাতৃভূমি—আমাদের সাধনার মহাতীর্থ—আমাদের ভারতবর্ষ—আমাদের কামনার ধন, আমাদের বাসনার স্বর্গ, আমাদের আরাধনার নন্দন-কানন, আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। একদিন আমরা ঐখান হইতে এই সুদূরে আসিয়াছিলাম। আবার আজ আমরা সেইখানে ফিরিয়া যাইব। ঐ শোন ভারতবর্ষের আহ্বান—ঐ শোন জন্মভূমির আহ্বান। কি মধুর, কি স্নেহ-পবিত্র সে আহ্বান। ঐ শোন। চলো।"

প্রস্তুত হও—সময় নাই।

"দেশবাসিগণ! আর সময় নষ্ট করিও না। তোমরা প্রস্তুত হও এবং এই মুহূর্ত্তেই শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হও। শীঘ্রই আমরা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিব, এবং ভারতভূমিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিব। অতঃপর দিল্লী অভিমুখে আমাদের ঐতিহাসিক যাত্রা সুরু হইবে। সর্ব্বশেষে ইংরাজটি ভারতবর্ষ

ত্যাগ করিলেই, এ যাত্রা শেষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নহে। দিল্লীর বড়লাট ভবনে যেদিন আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িতে থাকিবে এবং যেদিন ভারতের মুক্তি ফৌজ প্রাচীন লালকেল্লার অভ্যন্তরে বিজয় উৎসবে মাতিয়া উঠিতে পারিবে—কেবলমাত্র সেইদিনই এ অভিযানের শেষ হইবে।"

—সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দ্দেশনামা।

অবশেষে জাতীয় বাহিনী সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ১৯ শে মার্চ্চ তারিখে ভারত ভূমিতে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইল। এই সৈন্যগণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া পূর্ব্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারত-সন্তান বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহাদের জয়গান করিতে লাগিল।

ইনফল আক্রমণ

ইনফল মণিপুরের রাজধানী। ১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রহ্মদেশ হইতে মণিপুরে প্রথম পদার্পণ করে। ভারত আক্রমণকারী বাহিনীতে প্রধানতঃ তিনটি ব্রিগেড ছিল। কর্ণেল শাহ-নওয়াজের নেতৃত্বে ছিল "সুভাষ ব্রিগেড"—উহার সৈন্য সংখ্যা ৬২০০ জন। কর্ণেল ইনায়েৎ কয়ানীর নেতৃত্বে ছিল "গান্ধী ব্রিগেড"—উহার সৈন্য সংখ্যা ২৮০০ জন। কর্ণেল মোহন সিংএর নেতৃত্বে ছিল "আজাদ ব্রিগ্রেড"-উহার সৈন্য সংখ্যা ২৮০০ জন। এতদ্ভিন্ন আরও সহস্রাধিক ফৌজ

এই বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং সকলের পশ্চাতে কর্ণেল গুরুবক্স সিং ধীলনের নেতৃত্বে তিনহাজার সৈন্য লইয়া গঠিত "নেহেরু ব্রিগেড" এই বাহিনীর অনুগমন করিয়াছিল। সেনাপতি কর্ণেল ভোঁসলা, মেজর জেনারেল শাহ-নওয়াজ, লেঃ কর্ণেল সেহগল, মেজর ধীলন, ক্যাপ্‌টেন কীয়াণী ও লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথনের উপরে এই যুদ্ধ পরিচালনা করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। এই সৈন্যগণ স্থির করিয়াছিল তাহারা একে একে মণিপুর আসাম এবং চট্টগ্রাম ব্রিটিশ অধিকার হইতে মুক্ত করিবে এবং অনতিবিলম্বে অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেন্টের প্রধান কেন্দ্র ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতের এই অংশে স্থানান্তরিত করা হইবে।

'ইনফল' ও 'কোহিমা' দুই স্থান লক্ষ্য করিয়া একেবারে দুইটি অভিযান বাহির হইয়াছিল। ইনফল অভিযানের ভার 'সুভাষ ব্রিগেড' এবং 'গান্ধী ব্রিগেডে'র উপরে পতিত হইয়াছিল। 'সুভাষ ব্রিগেডের' অধিনায়ক মেজর জেনারেল শাহ-নওয়াজ জাপানীদের দ্বারা গঠিত কয়েক দল সৈন্য সহ শত্রুপক্ষের উপরে আক্রমণ আরম্ভ করেন। শত্রুপক্ষের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়—উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ক্ষয় হয়। ভারতীয়দের ক্ষতিই হয় অধিক। সেনা নায়ক শাহ-নওয়াজ মণিপুরের মাটীতে প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

যুদ্ধে আহত সৈন্যগণের সেবা শুশ্রূষার ভার ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর নারী সেনাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।

১৮ই মার্চ্চ হইতে ৫ই এপ্রেলের মধ্যে ভারতীয় সেনা বাহিনী

ইনফল-কোহিমা অঞ্চলের কতকাংশ ব্রিটিশ অধিকার হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয় এবং তৎকালে ব্রিটিশ বাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি ব্রিটিশ বাহিনী যুদ্ধে বিরত হয় নাই। ইতিমধ্যে তাহাদের প্রচুর পরিমাণে বিমান সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্ত্তমান যুদ্ধ বাহুবলের যুদ্ধ নয়—বিমান বহরই যুদ্ধের প্রধান অবলম্বন। উপর হইতে বৃষ্টিধারার মত বোমা বর্ষণে আজাদ বাহিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। জাপান হইতে বিমান বহর আসিবে এই আশায় তাহারা কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া অবশেষে পশ্চাদপসরণ করিবার সংকল্প করিল।

অভিযান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জাপ গভর্ণমেণ্টের সহিত সুভাষচন্দ্রের চুক্তি হইয়াছিল যে ভারতের এলাকায় যে সমস্ত ভূভাগ ব্রিটিশ অধিকার হইতে উদ্ধার করা হইবে তাহার সমস্তই আজাদ গভর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে মণিপুরে প্রায় ১৫ শত বর্গ মাইল ভূমি আজাদ হিন্দ সরকারের অধিকারে আসিল। কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জি মুক্ত ভারতের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেশ শাসনের ভার মেজর কিয়ানীর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।

ইনফল হইতে পশ্চাদপসরণ

ভারতীয় সেনা বাহিনীর দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। রসদ ও সমরোপকরণ আসিবার রাস্তাগুলি

অচিরে জলপ্লাবিত হইয়া গেল। ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল; এবং পাঁচমাস যুদ্ধ করিয়া কয়েকটি স্থান অধিকার করিবার পর অকস্মাৎ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে তাহাদের অগ্রগতি বন্দ হইয়া গেল। বর্ষার প্রকোপে আজাদগভর্ণমেণ্টের সহিত সংবাদ আদান প্রদান ও স্থগিত হইল। সৈন্য বাহিনীর রসদ ও যুদ্ধের উপকরণ সম্ভার না আসাতে জুলাই মাসেই সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। সুযোগ পাইয়া ব্রিটিশ সৈন্যগণ ব্রহ্ম অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে নবীন উৎসাহ লইয়া জাতীয় বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেও, তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত না হইয়া নূতন সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। একথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে, যে 'ইনফল জয়ে' বাধা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আজাদগভর্ণমেণ্ট, জাতীয় বাহিনী এবং পূর্ব্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয় এই আঘাত নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিলেন। বিন্দুমাত্র ভগ্নোৎসাহ না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাঁহারা নূতনপথে এই যুদ্ধ পরিচালনা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অগণিত অর্থ ও নূতন নূতন সৈন্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিপুল সৈন্য-বাহিনী এবং অপরিমিত সমর-সম্ভার উপস্থিত হওয়াতে দেশীয় বাহিনী তাহাদের অগ্রগতি রোধ করিতে অসমর্থ হইল এবং ইংরাজ সৈন্য ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া মান্দালাই ও রেঙ্গুন অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল।

ব্রহ্ম ও রেঙ্গুনের ভারতীয়গণ এই সকল ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। তাহারা অর্থ ও সৈন্য দিয়া এমন কি শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া যুদ্ধের ফলাফল দেখিবে এইরূপ স্থির করিল। প্রতি মাসের ২১শে তারিখে তাহারা "অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট দিবস" পালন করিয়া আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। ৪টা হইতে ১১ই জুলাই পর্য্যন্ত "নেতাজী-সপ্তাহ", ১৮ই অক্টোবর হইতে ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত "অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বার্ষিকী দিবস" এবং ২৩শে জানুয়ারী হইতে ২৯শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত "**নেতাজী জয়ন্তী**" পালন করিয়া তাহারা নেতাজীর প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল।

ইনফল অভিযান ব্যর্থ হইলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের মনোবল নষ্ট হয় নাই। কিন্তু মণিপুর যুদ্ধের ব্যর্থতার ফলে জাপান বাহিনী একেবারেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। ১৯৪৫ সালের ৮ই মার্চ্চ তারিখে মিত্র সৈন্য মান্দালাই সহরে প্রবেশ করে এবং ২০শে মার্চ্চ মান্দালাই সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। অতঃপর রেঙ্গুনের ৫০ মাইল উত্তরে মিত্র সেনার সহিত জাপ সৈন্যের যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে জাপানীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। আজাদ হিন্দ সৈন্যগণ অনন্যোপায় হইয়া একে একে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল, যাহারা যুদ্ধে বিরত হইল না তাহাদের অধিকাংশই মিত্রপক্ষের হস্তে বন্দী হইল।

রেঙ্গুন পরিত্যাগ

১৯৪৫ সালের এপ্রেল মাসে ব্রিটিশ সৈন্যগণ যখন রেঙ্গুন অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল নেতাজী তখন রেঙ্গুনে ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সৈন্যগণের সম্মুখীন হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে প্রয়োজন হইলে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেননা। মন্ত্রীগণ এবং জাতীয় বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে অবিলম্বে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে থাকিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব একেবারেই অনুমোদন করেন নাই।

এপ্রেল মাসের ২২শে ব্রিটিশ সৈন্যগণ একেবারেই রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। নেতাজী অচল, অটল—তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না—কিছুতেই রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিবেন না। এদিকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশের ট্যাঙ্ক রেঙ্গুনে প্রবেশ করিবে, এবং নেতাজীর অমূল্য জীবন কাল স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। মন্ত্রীগণ এবং উর্দ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারিগণ অশ্রু-সজল-নয়নে নেতাজীকে কহিলেন—"প্রভু এই চরম সময়ে—এই আসন্ন মৃত্যুর প্রাক্কালে আমাদের অনুরোধেও আপনি রেঙ্গুন পরিত্যাগ করুন।" পাষাণ দ্রবীভূত হইল—নেতাজীর হৃদয় টলিল—তাঁহার আত্মঘাতী সংকল্পে প্রবল বাধা উপস্থিত হইল। ২৪শে এপ্রেল সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে নেতাজী পদব্রজে রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিলেন।

পদব্রজে ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি তিন সপ্তাহে ব্যাঙ্ককে পৌঁছিলেন। রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিবার পর এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই নেতাজী ব্রিটিশ কামানের গভীর গৰ্জ্জন শুনিতে পাইলেন। ইংরাজ বাহিনী সমাগত প্রায়। এই উপলক্ষে তিনি কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এবং কিরূপ শারীরিক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সহযাত্রীগণের স্মৃতিপথ হইতে কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

নেতাজীর আদেশ

Last special order of the Day

রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে ২৪শে এপ্রেল তারিখে নেতাজী তাঁহার প্রিয় সেনা বাহিনীর জন্য যে বিশেষ আদেশ পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের উচ্চ কৰ্ম্মচারিবৃন্দ এবং প্রিয় সৈনিকগণ—

আমি গভীর শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। এই রেঙ্গুনে গত ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে বীরত্বের সহিত আপনারা অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও আপনারা অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিতেছেন। ইনফল এবং

ব্রহ্মদেশীয় প্রথম যুদ্ধে আমরা পরাজিত হইয়াছি, একথা সত্য বটে কিন্তু মনে রাখিবেন ইহা প্রথম যুদ্ধ মাত্র। আমাদিগকে আরও অনেকগুলি যুদ্ধ করিতে হইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এ বিশ্বাস আমার চিরদিনই আছে। সুতরাং আমি পরাজয় মানিয়া লইব না। আপনারা ইনফলের ময়দানে, আরাকানের পার্ব্বত্য প্রদেশে, বনে জঙ্গলে এবং ব্রহ্মের নানা প্রদেশে শত্রু সৈন্যকে যেরূপভাবে বাধা দিয়াছেন, তাহা ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সঙ্গিগণ, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির সময়ে আমি আপনাদিগকে একটি মাত্র আদেশ দিয়া যাইতেছি, যদি আপনারা বর্ত্তমান সংগ্রামে সাফল্যমণ্ডিত হইতে না পারেন, তথাপি আপনারা আপনাদের আত্মসম্মান অটুট রাখিয়া এবং সৈনিকের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বীরোচিত কার্য্য করিবেন। আপনাদের এই মহান্ স্বার্থত্যাগের ফলে আপনাদের সন্তান সন্ততিগণ ক্রীতদাস না হইয়া স্বাধীন মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা সমস্ত জগতে ঘোষণা করিবে, "আপনারা - তাহাদের পিতৃপুরুষগণ মণিপুর, আসাম এবং ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু আপনারা বিজয় এবং গৌরবের পথ সুগম এবং সহজ করিয়া গিয়াছেন।" ভারত যে স্বাধীন হইবে—এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় সম্মান, এবং ভারতীয়গণের বীরত্বের খ্যাতি

অক্ষুণ্ণ থাকিবে এই আশায় আমি আমাদের জাতীয় ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। আপনারা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অগ্রগামী সৈনিক, সুতরাং আপনারা ভারতের জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্য আপনাদের প্রিয় বলিয়া যাহা কিছু এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। ইহাতে আপনাদের সঙ্গিগণ যখন অন্যত্র স্বাধীন সংগ্রামে লিপ্ত হইবেন, তখন তাঁহারা আপনাদের এই মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইবেন।

আপনাদের ক্ষণিক পরাজয়ের দুঃখ ও গ্লানির অংশ গ্রহণ করিবার জন্য এই বিপদের সময়ে আমি রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিবনা ইহাই স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি নিজের মতে কাজ করিতে পারিলাম না। আমার মন্ত্রীগণের ও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের পরামর্শে আমি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আমি মনে করিয়াছি অন্যত্র গিয়া আমি এই সংগ্রাম পরিচালনা করিব। আপনাদের দুঃখ কষ্ট ও স্বার্থত্যাগ ব্যর্থ হইবেনা। আমি ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর আমার জন্মভূমির ৩৮ কোটী লোকের সেবা করিবার জন্য যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি, আমরণ আমি তাহা পালন করিব এবং তাহাদের স্বাধীনতার জন্য চিরদিনই সংগ্রামে লিপ্ত থাকিব।

উপসংহারে আমি আপনাদিগকে বলিতেছি যে আপনারা আমার ন্যায় বিশ্বাস করিবেন যে উষার আলোক পূর্ব্বগগন উদ্ভাসিত করিবার পূর্ব্বে সমগ্র জগৎ গভীরতম অন্ধকারে আবৃত

থাকে। শেষ কথা ভারত স্বাধীন হইবেই অনতিবিলম্বেই স্বাধীন হইবে। ঈশ্বর আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ
জয়হিন্দ
(স্বাক্ষর) সুভাষ চন্দ্র বসু

আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ

সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিবার পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজন প্রধান সেনানী কিছুদিন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড মিত্র শক্তির নিকটে শীঘ্রই তাঁহারা পরাভূত হইলেন। ১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রেল লেঃ কর্ণেল সেহগল আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৪ই মে কর্ণেল ধীলন এবং ১৮ই মে মেজর জেনারেল শাহ-নওয়াজ মিত্রসৈন্য কর্তৃক বন্দী হন।

ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর ৬০ জন বীরাঙ্গনা ও অল্পসংখ্যক সৈনিক লইয়া সুভাষচন্দ্র ব্যাঙ্ককে উপস্থিত হন এবং সেই স্থানেই আজাদ হিন্দ ফৌজের হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মের পতন হইলে মিত্রপক্ষের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহারাও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর স্বাধীনতা সংগ্রামে এইরূপে যবনিকাপাত হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ

১৯৪৫ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে জাপান নিউজ এজেন্সীর নিকট হইতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়। তাঁহারা প্রকাশ করেন যে সুভাষচন্দ্র ১৬ই আগষ্ট তারিখে সিঙ্গাপুর হইতে বিমান যোগে টৌকিও যাত্রা করেন। ১৮ই আগষ্ট তারিখে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর রূপে আহত হন এবং জাপানের এক হাঁসপাতালে মধ্যরাত্রেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হে বঙ্গের অদ্বিতীয় বীর, হে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র! মধ্যাহ্ন তপনের সমুজ্জ্বল প্রভার ন্যায় তোমার প্রতিভা-রশ্মি সমগ্র জগতে বিকীর্ণ করিয়া সহসা আজ তুমি কোন্ কল্পলোকের অধিবাসী হইয়াছ, জানিনা, কিন্তু যে জন্মভূমির দাসত্ব-শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য তুমি জীবন-ব্যাপী দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়াছিলে, সেই অনাদৃতা, চিরলাঞ্ছিতা ভারত-মাতা ভূলুন্ঠিতা হইয়া অশ্রু-সজল নেত্রে এখনও তোমারই আশা-পথ চাহিয়া আছে। ঐ শোন—পরাধীন ভারতের চল্লিশ কোটী নরনারী রণক্ষেত্রশায়ী মোহনলালের ভাষায় তোমারই উদ্দেশে করুণ কণ্ঠে গাহিতেছে—

তুমি অস্তাচলে দেব! করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ-রজনী।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র সচিব।

২। ক্যাপ্টেন্ মিস্ লক্ষ্মী—নারী-সংগঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব।

৩। মিঃ এস. এ. আয়েঙ্গার—প্রচার সচিব।

৪। লেঃ কঃ এ. সি. চ্যাটার্জি—অর্থ সচিব

৫। লেঃ কঃ আজিজ আমেদ

৬। লেঃ কঃ এস্. এস্. ভগৎ

৭। লেঃ কঃ জে. কে. ভোঁসলে

৮। লেঃ কঃ গুলজার সিং

৯। লেঃ কঃ এম. জেড্. কিয়ানী

১০। লেঃ কঃ এ. পি. লোকনাথন্

১১। লেঃ কঃ ঈশান কাদির

১২। লেঃ কঃ শাহনওয়াজ—সেনা বাহিনীর প্রতিনিধি

১৩। মিঃ এ. এম. সহায়—সম্পাদক (মন্ত্রীর পদমর্য্যাদা সম্পন্ন)

১৪। শ্রীযুক্ত রাস বিহারী বসু—সর্ব্বোচ্চ পরামর্শদাতা

১৫। মিঃ করিম গণি
১৬। মিঃ দেবনাথ দাস
১৭। মিঃ ডি. এম্. খান
১৮। মিঃ এ. ইয়েলাপ্পা
১৯। মিঃ আই, থিবি
২০। সর্দ্দার ঈশ্বর সিং

(১৫–২০) পরামর্শদাতাগণ।

২১। মিঃ এ. এন্. সরকার—আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদম্ কদম্ বাঢ়ায়ে যা
খুসীকে গীত গায়ে যা
এ জীন্দগী হ্যায় কৌম কী
তো কৌম পে লুটায়ে যা ॥
তু শেরে-ই-হিন্দ আগে বঢ়
মরণ্ সে ফির ভী তু ন ডর
আসমান্ তক উঠাকে শির
জোসে বতন বঢ়ায়ে যা ॥
তেরী হিম্মত বাঢ়তী রহে
খুদা তেরে শুনতা রহে
যো সামনে তেরে চঢ়ে
তো খাক সে মিলায়ে যা ॥
চলো দিল্লী পুকারকে
কোম-ই নিশান সামালকে
লাল কিল্লে পৈ গাড়কে
লহ্‌রায়ে যা লহ্‌রায়ে যা ॥

জয়হিন্দ—

বঙ্গানুবাদ

তালে তালে তালে ফেলিয়া পা
আনন্দ-গীত গাহিয়া যা
প্রাণ যদি তোর দেশের তরে
তারি পায়ে দে লুটিয়ে তা ॥
ভারতের বাঘ অগ্রসর
মরণে কভু সে করেনা ডর
আসমানে শির তুলিয়ে ধর
শক্তি বাড়িয়ে এগিয়ে যা ॥
বাড়বে শক্তি শক্তিমান
শুনেছেন ডাক ভগবান
সামনে যেজন আসবে ধেয়ে
ভস্ম করিয়া চলিয়া যা।
'দিল্লী চলো' হুংকার করি
জাতীয় পতাকা দর্পেতে ধরি
উড়াইতে লাল কেল্লা-উপরি
তরঙ্গ সম এগিয়ে যা ॥

জয়হিন্দ—

"গল্পদাদু"

নেতাজীর বাণী

(১) আমাকে তোমার রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা আনিয়া দিব (Give me your blood, and I promise you freedom.)

(২) যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও মৃত্যুকে বরণ করিতে শিক্ষা কর (If you want to live, first learn to die.)

(৩) স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য সুসংযত সৈনিকের ন্যায় স্থির ধীর পদক্ষেপের সহিত সম্মুখে অগ্রসর হও (Like a thoroughly disciplined soldier with slow steady and sure steps march onward for the fight of freedom at the call of death.)

নেতাজীর বৈশিষ্ট্য

(১) মিস্টার এস্. এ আয়ার (Publicity and Propaganda minister) আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে নেতাজি যে সময়ে পূর্ব্ব এশিয়ায় জাতীয় বাহিনী গঠন করিয়া ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন তিনি রাত্রিকালে কেবলমাত্র **২ঘণ্টা ৪০ মিনিট** কাল নিদ্রা যাইতেন। কিন্তু ব্রিটিশ

গভর্ণমেণ্ট ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পরে তিনি **দুই ঘণ্টার** অধিক নিদ্রা যাইতেন না।

(২) দিল্লীর কারাগার হইতে জাতীয় বাহিনীর সদ্য মুক্ত কয়েকজন সৈনিক নেতাজীর বিশিষ্টতা সম্বন্ধে অপর একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন. তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি **রণসাজে সজ্জিত** না হইয়া কখনও বাহির হইতেন না। এতদ্ভিন্ন একখানি তরবারি, একটি বন্দুক এবং দশদিনের খাদ্য সে সময়ে তাঁহার সঙ্গে থাকিত। মন্ত্রীগণ তাঁহার অনুগামী হইতেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া তিনি কখনও কখনও অতর্কিতভাবে তাঁহার পদাতিক সেনানিবাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া দিতেন।

(৩) স্বাধীন ভারত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সভাপতিরূপে নেতাজী যখন নিরতিশয় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সহিত কালযাপন করিতেছিলেন, সেই সঙ্কট জনক মুহূর্ত্তেও তিনি কিরূপ সহৃদয়তা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার একজন দেহরক্ষী ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এই ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্রের গৃহপালিত এক বানর-দম্পতী ছিল। তিনি কয়েকটি পারাবত ও একটি কুকুরও পুষিয়াছিলেন। পশুপক্ষি-গণের মধ্যে উক্ত বানর-দম্পতী তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি স্বহস্তে তাহাদিগকে আহার করাইতেন এবং তাহারা পীড়িত হইলে তিনি স্বহস্তে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন।

প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি “জয়হিন্দ” রবে তাহাদিগকে অভিবাদন করিতেন। তাহারাও হস্ত উত্তোলন করিয়া নেতাজীকে প্রত্যভিবাদন করিত।

নেতাজীর অনুপস্থিত কালে একদিন বানর-দম্পতীর সহিত কুকুরের বিবাদ হইল এবং কুকুরটি পুরুষ বানরটীকে দংশন করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিল। নেতাজী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বানরের অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। সন্তান পীড়িত হইলে জননী যেমন প্রাণপাত করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করেন, এই শাখা-মৃগের শারীরিক ক্ষত উপশমের জন্য নেতাজীও সেইরূপ পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রাণরক্ষা হইল না। ইহাতে সুভাষচন্দ্র এইরূপ শোকাভিভূত হইলেন এবং কুকুরের উপর এইরূপ ক্রোধান্বিত হইলেন যে তিনি অবিলম্বে তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন।

সুভাষচন্দ্র সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতেন, এবং ভগবতোপাসনা ও ব্যায়াম শেষ করিয়া দৈনন্দিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ব্রহ্মদেশের অধিবাসীগণের ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। সামরিক পরিচ্ছদ অথবা পাদুকা পরিধান করিয়া তিনি কদাচ তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে (Pagoda) পদার্পণ করিতেন না। উক্ত ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এরূপ অনুরাগ ছিলযে তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া সেই দেবতাগণের উপাসনা করিতেন। পারাবতগুলিকেও প্রতিদিন তিনি স্বহস্তে আহার করাইতেন।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ডাকটিকিটের নমুনা

উপরে যে ডাকটিকিটের নমুনা দেওয়া হইল ঐ টিকিটগুলি আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের জন্য জার্ম্মাণিতে মুদ্রিত হইয়াছিল। টিকিটগুলির প্রতিকৃতি আমাদের জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ অনুকূল। মূল্য অনুসারে টিকিটগুলির প্রতিকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কোনও টিকিটে হল চালনার দৃশ্য আছে, কোনও খানিতে চরকা অঙ্কিত আছে। কোনও খানিতে সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র বিদ্যমান। অপর খানিতে জাতীয় বাহিনী যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপন উপলক্ষে এই

প্রতিভাবান মহাপুরুষ স্বাধীন রাজ্য সংক্রান্ত কোনও বিভাগের কার্য্যই অসম্পূর্ণ রাখেন নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় টিকিটগুলি আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই জার্ম্মাণিস্থিত আমেরিকান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের করতলগত হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্রের মনীষা ও চরিত্র বিশ্লেষণ

নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক মিষ্টার হরিবিষ্ণু কামাথ সুভাষচন্দ্রের জয়ন্তী উপলক্ষে বলিয়াছেন—

ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের ঋষি সুভাষচন্দ্রের অদ্ভুত কার্য্য কলাপ আমাদের অন্তরে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার জাতীয় বাহিনী গঠন এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ভারতের স্বাধীনতা ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনা—বাল্যকালে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য হিমালয় ভ্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়সে রাজনৈতিক মুক্তির জন্য ভারতের বাহিরে গমন একই অধ্যায় সূচিত করিতেছে। এ যেন এক আজন্ম-বিপ্লবীর ইতিহাস—যাহা পরাধীন জাতির দুঃখ দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা সাম্রাজ্যবাদের সহিত কোনও প্রকার আপোষ মীমাংসা করিতে একেবারেই সম্মত হয় নাই।

সুভাষবাবু আপনাকে একজন যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া মনে করিতেন এবং তিনি যে একজন প্রকৃত ঋষি ছিলেন তাহা তাঁহার

অসম্পূর্ণ আত্মজীবনীতে (unfinished autobiography) লিখিত আছে। তিনি যে কেবল রাজনীতিবিদ্ ছিলেন এমন নহে, তিনি বর্ত্তমান জগতের একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিপ্লবী ছিলেন। গঠনমূলক কার্য্যে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। তিনি যে সাধারণ মানব অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কোনও বিষয়ের প্রতিবাদকালে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত। তিনি নির্ভীক কর্ণধারের ন্যায় সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের মহান্ আদর্শ তাঁহার সমগ্র জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ যে আদর্শ লইয়া কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছে, চিন্তাশীল সুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাহার রূপ দিয়াছেন।

১৯২৮।২৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত কোনওরূপ আপোষ আলোচনা না করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে রোগশয্যায় শায়িত হইয়া তিনি ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সভাতেই তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে "বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন।" ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে চরমপত্র দিবার মত তিনি এই সভাতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দেশকে প্রস্তুত হইতেও উপদেশ দিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাকে "Quit India" বা "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাবের জনক বলা যাইতে

পারে। ভারতীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন ও তাহাদের বীরত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপ সমস্তই ভারতের স্বাধীনতা লাভের কর্ম্মসূচির অন্তর্গত। তিনি তাঁহার এই প্রথম উদ্যমে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ ব্যর্থতা ইতিহাসে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই ব্যর্থতাই অনেক সময়ে সফলতার গৌরবে মণ্ডিত হইয়া থাকে।

জাপানের বিখ্যাত সংবাদপত্র সম্পাদক C. Haziwara আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন—

সুভাষবাবুর চরিত্রে ভাব-প্রবণতা এবং বিবেক এতদুভয়ের যেরূপ সমন্বয় দৃষ্ট হয়, সেরূপ সচরাচর আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুভাষবাবু বলিতেন তাঁহার এবং মহাত্মা গান্ধীর গন্তব্য স্থল একই, কিন্তু উভয়ের পথ বিভিন্ন। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য সুভাষবাবুর সহিত মিলিত হওয়া মহাত্মা গান্ধীর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না।

সম্পাদক মহাশয় রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর এবং ম্যানিল্লা এই চারিটি সংবাদপত্র সম্মেলনে সুভাষবাবুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সুভাষবাবু যে একজন ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এ ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন আই. এন. এর জনৈক সৈনিক কয়েকটি আভ্যন্তরিক সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতে আসিয়া অবগত হইয়াছিলেন, সুভাষবাবু সিঙ্গাপুর হইতে রেডিও যোগে যে বক্তৃতা করিতেন, ভারতরক্ষা আইনানুসারে তাহা শ্রবণ করা আইন-বিরুদ্ধ

হইলেও তাঁহাব স্বদেশবাসিগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত উহা শ্রবণ করিত।

১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসে সুভাষবাবু যখন রেঙ্গুনে আসেন, তখন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার হইতে দুই লক্ষ ছিল। নেতাজীর এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, ভারত ও ব্রহ্মদেশের সংগঠনমূলক কার্য্য আর একটু অগ্রসর হইলে, সৈন্য সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে।

সম্পাদক মহাশয় উপসংহারে বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর সহিত অধিকাংশ বিষয়ে সুভাষবাবু একমত হইলেও তিনি তাঁহার অহিংসনীতিতে আস্থাবান ছিলেন না। তিনি বলিতেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে সুফল এই হইবে যে তাঁহার সহযোগীগণের এমন কি ভারতের জন সাধারণের অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সঞ্চার হইবে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। তবে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে হয়ত তাঁহার জীবনকেই আহুতি দিতে হইবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মতিথি উপলক্ষে মনীষী আর. এস. রুইকর বলিয়াছেন—

মহাত্মা গান্ধীর অসামান্য প্রভাবও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদকে ধ্বংশ করিতে পারে নাই। সময়ে সময়ে তিনি সাফল্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে ব্রিটিশশক্তি পুনরায় সবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতা আজও মহাত্মার আদর্শই রহিয়া গিয়াছে। ১৯২০—৩০ সালে ইহা যেখানে ছিল, আজও

সেইখানেই আছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যাহা পারেন নাই, নেতাজী তাহাই করিয়াছিলেন। নেতাজী কেবলমাত্র প্রবল ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে সংগ্রাম করেন নাই', তিনি আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র মাইলব্যাপী ভূখণ্ডের উপর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা প্রভুত্ব করিয়াছে। হইতে পারে ইহা দুই তিন বৎসর মাত্র ছিল। কিন্তু এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে এরূপ নেতা কোথায় ?

সামরিক বিচারালয়ে সাক্ষ্য প্রদানকালে ক্যাপ্টেন শাহ-নওয়াজ নেতাজীর মনোভাব এইরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—

"যখন দেখিলাম ভারতের কোটী কোটী নরনারীকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না করিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞ ও নিরক্ষর করিয়া রাখিয়াছেন, তখনই আমি ভারতের শাসন-পদ্ধতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইলাম। আমার মনে হইল ইহা অত্যন্ত অবিচার এবং এই অবিচার নিবারণ কল্পে আমি আমার স্বদেশ, আত্মীয়স্বজন এমনকি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কৃতসঙ্কল্প হইলাম।"

সমাপ্ত